১৪. সন্ধিবিচ্ছেদ করো :

স্বস্তি, নগেন্দ্র, আরেক।

১৫. নীচের গদ্যটিতে যতিচিহ্ন ব্যবহার করো : ধমক দিয়ে বললেন এটা আবার কী কোত্থেকে এল চাকর কাঁচুমাচু হয়ে বলল আজ্ঞে ছেলেরা কী যেন খেলা করছিল।

১৬. পাশের প্রতিটি বিষয় নিয়ে পাঁচটি করে স্বাধীন বাক্য লেখো :

গয়না, পরিবার, ঘুঁটে।

১৭. বছরের কোন সময় কোন খেলা খেলতে তুমি ভালোবাসো সেই অনুযায়ী ছকটি পূরণ করো :

ঋতু	খেলা
গ্রীষ্মের সময়	
বর্ষার সময়	
শীতের সময়	
বসন্তের সময়	

কয়েকটি প্রাসঙ্গিক তথ্য

মুকুল — উনিশ শতকের শেষদিকে শিশুদের উপযোগী যে সব মাসিকপত্র প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে *মুকুল* অন্যতম। প্রখ্যাত সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সম্পাদনায় *মুকুল* প্রকাশিত হতো। রচনার গুণে, সহজ-সরল ভাষায় এবং চোখ ভোলানো ছবির জন্য *মুকুল* সর্বপ্রথম শিশুদের জন্য প্রকাশিত মাসিকপত্রের জগতে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল।

প্রবাসী — ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় *প্রবাসী* পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মাসিক পত্ররূপে *প্রবাসীতে* উপন্যাস, ছোটোগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হতো। এই পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথের অজস্র রচনা। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নব্য ভারতীয় শিল্পকলা বিষয়ক রচনাগুলি *প্রবাসীতে* ছাপা হতো। সেকালের অনেক প্রখ্যাত সাহিত্যিক এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন।

হ য ব র ল — প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায় রচিত *হ য ব র ল* বাংলা সাহিত্যের একটি অসামান্য গ্রন্থ। সাধারণভাবে তাঁর লেখায় আজগুবি, উদ্ভট খেয়ালের পরিচয় মেলে। এই বইতে উদ্ভট কল্পনা আর বাস্তব জীবনকে চমৎকার ভাবে তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন। কেবল শিশুরা নয়, সব বয়সের মানুষ সুকুমার রায়ের *হ য ব র ল* থেকে আনন্দ খুঁজে পায়।

মধুপুর — পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খন্ডের অন্তর্গত *মধুপুর* স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবে সুপরিচিত। মধুপুরের মনোরম পরিবেশ সকলকে আকর্ষণ করে। বহু বাংলা গল্প উপন্যাসে এবং লেখকদের অভিজ্ঞতায় পশ্চিমের জল-হাওয়ার কথা পাওয়া যায়। সেই পশ্চিমের অন্যতম একটি জনপদ মধুপুর।

মা ল গা ড়ি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

চাই না আমি তুফান কী মেল ট্রেন,
মালগাড়ি হই একটি শুধু যদি
ঘটর ঘটর দিনরাত্তির চলি,
নেইকো তাড়া, যেন ভাটার নদী।

জন্মদিনে মিষ্টি একটা পরি
ভুলে যদি আসে আমার বাড়ি,
চেয়ে নেব একটি শুধু বর,—
বলব, 'আমায় করো না মালগাড়ি।'

প্যাসেঞ্জার কী মেল ট্রেন সব যত
শুধু কাজের ধান্দা নিয়েই আছে,
স্টেশন পেলেই যাত্রী ওঠায় নামায়,
ভাবনা শুধু লেট হয়ে যায় পাছে।

আমার শুধু নিজের খুশির চলা,
দায় নেইকো টাইমটেবিল দেখার।
যত দূরে-ই যেখানে যাই নাকো
সারা লাইন শুধু আমার একার।

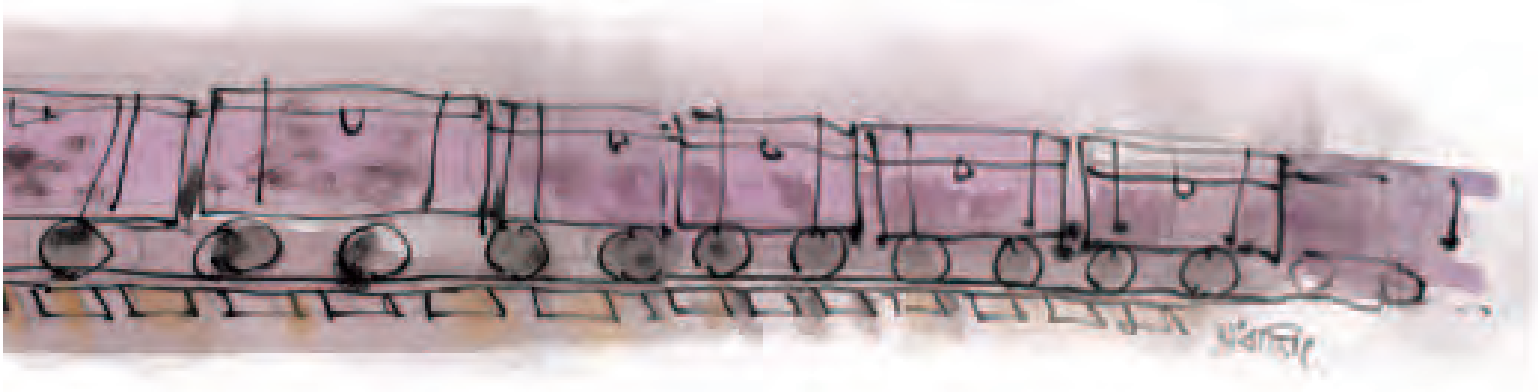

ট্রেনগুলো তো এক লাইনেই ছোটে,
যাওয়া-আসার বাঁধা ঠিক-ঠিকানা।
আমার জন্যে সব রাস্তাই খোলা
থামতে যেতে কোথাও নেই মানা।

ওরা যখন হাঁসফাঁসিয়ে মরে,
যাচ্ছি যাব করেই আমার যাওয়া।
ওরা শুধু পৌঁছোতে চায় ছুটে,
আমার সুখ তো অশেষ চলতে পাওয়া।

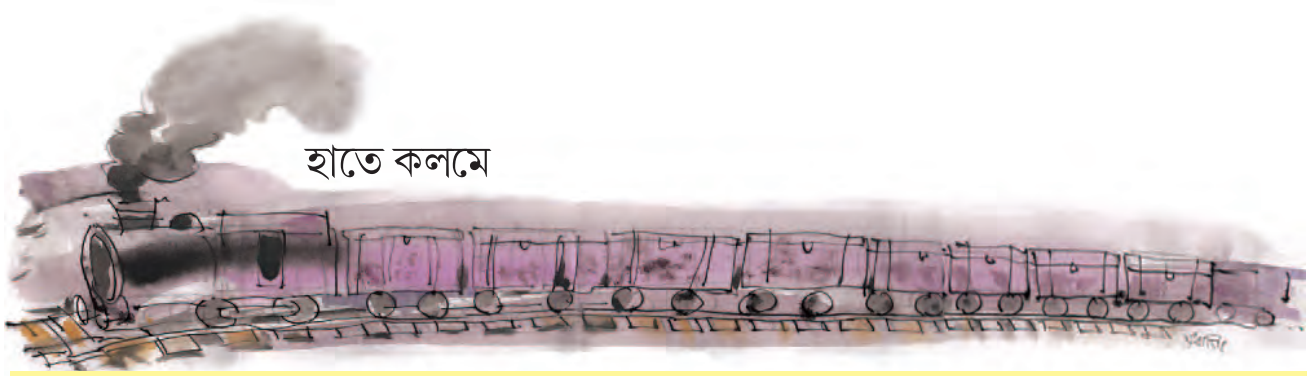

হাতে কলমে

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৩—১৯৮৮) : বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরে গদ্যে এবং পদ্যে নতুন রীতি যাঁদের হাত ধরে শুরু হয়েছিল তাঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র অগ্রগণ্য। তিনি গল্প, কবিতা, উপন্যাস, শিশু-কিশোর সাহিত্য, নাটক, প্রবন্ধ এবং অনুবাদমূলক রচনা সব বিষয়েই ছিলেন সমান দক্ষ। *কালিকলম* পত্রিকার সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্র 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। *প্রথমা, সম্রাট, সাগর থেকে ফেরা, ফেরারি ফৌজ* ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ, *পাঁক, হানাবাড়ি, মিছিল, বিসর্পিল* ইত্যাদি উপন্যাস, *তেলেনাপোতা আবিষ্কার, শুধু কেরানি, শৃঙ্খল, হয়তো* ইত্যাদি ছোটোগল্প তিনি রচনা করেছেন। ছোটোদের জন্য নানান রকমের রহস্য গল্প এবং গোয়েন্দা কাহিনি লিখেছেন। *ঘনাদা* চরিত্র প্রেমেন্দ্র মিত্রের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। কবি তাঁর *সাগর থেকে ফেরা* কাব্যগ্রন্থের জন্য *রবীন্দ্র পুরস্কার* এবং *অকাদেমি পুরস্কার* পেয়েছিলেন।

১. প্রেমেন্দ্র মিত্র কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?

২. তাঁর সৃষ্ট একটি বিখ্যাত চরিত্রের নাম লেখো।

৩. **একটি বাক্যে উত্তর দাও:**

৩.১ 'মালগাড়ি'-র চলাকে কবিতায় কার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

৩.২ কথকের জীবনে কোন বিশেষ দিনটিতে পরির সঙ্গে তার দেখা হতে পারে?

৩.৩ প্যাসেঞ্জার ট্রেন কোন কাজের ধান্দা নিয়ে থাকে?

৩.৪ 'মালগাড়ি' কোন কাজে ব্যবহৃত হয়?

৩.৫ সত্যিই কি মালগাড়ির টাইমটেবিল অনুযায়ী চলার প্রয়োজন নেই?

৩.৬ প্যাসেঞ্জার বা মেল ট্রেনের তুলনায় মালগাড়ির ধীরগামী হওয়ার কারণ কী বলে তোমার মনে হয়?

৩.৭ আপ ট্রেন আর ডাউন ট্রেন বলতে কী বোঝায়?

৩.৮ তোমার জানা এমন কয়েকটি যানবাহনের নাম লেখো যেগুলি যাত্রীপরিবহণ করে না।

৪. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৪.১ জোয়ার আর ভাঁটায় নদীর চেহারা কেমন হয়?

৪.২ এই কবিতায় পরিদের প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে? পরির প্রসঙ্গ তুমি এর আগে কোন কোন গদ্য, কবিতায় পড়েছ?

৪.৩ মালগাড়ি হয়ে কবিতার কথক কোন সুখ অনুভব করতে চায়?

৪.৪ কবিতায় 'ঘটর ঘটর' শব্দটি মালগাড়ির শব্দ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। তুমি এমন কিছু শব্দ লেখো যা দিয়ে যন্ত্র বা যানবাহনের শব্দকেই বোঝানো হয়ে থাকে।

৫. **গদ্যরূপ লেখো :**

৫.১ মালগাড়ি হই একটি শুধু যদি ঘটর ঘটর দিনরাত্তির চলি।

৫.২ চেয়ে নেব একটি শুধু বর।

৫.৩ ভাবনা শুধু লেট হয়ে যায় পাছে।

৫.৪ যত দূরেই যেখানে যাই নাকো সারা লাইন শুধু আমার একার।

৫.৫ যাচ্ছি যাব করেই আমার যাওয়া।

শব্দার্থ : মেলট্রেন — দ্রুতগামী রেলগাড়ি। লেট — দেরি। পাছে — নয়তো। টাইম টেবিল — সময়সারণি। ঠিক-ঠিকানা — অনির্দিষ্ট। হাঁসফাঁসিয়ে — অস্থির হয়ে। অশেষ — শেষ নেই যার।

৬. **প্রতিটি শব্দের সমার্থক শব্দ লেখো ও সেগুলি বাক্যে ব্যবহার করো :**

বাড়ি, নদী, ভাবনা, খুশি, ধান্দা, তুফান, রাস্তা।

৭. **'ভালো-মন্দ' —এর মতো বিপরীত অর্থের শব্দ পাশাপাশি আছে এমন তিনজোড়া শব্দ কবিতা থেকে বের করে লেখো।**

৮. **ছক করে নীচের শব্দগুলি থেকে ঘোষ বর্ণ ও অঘোষ বর্ণ আলাদা করে বসাও :**

তুফান, দেখা, ছুটে, কাজ, মিষ্টি, যাত্রী।

৯. কবিতাটিতে যেকটি ইংরাজি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি হলো — মেলট্রেন, প্যাসেঞ্জার, স্টেশন, লেট, লাইন, টাইমটেবিল। শব্দগুলি প্রতিটিই রেলগাড়ি সংক্রান্ত। এবার তুমি বাস ও সেই সংক্রান্ত ইংরাজি শব্দগুলির একটি তালিকা তৈরি করো।

১০. তুমি একটি মালগাড়ি দেখতে পেলে। মালগাড়ি সম্বন্ধে তোমার মনে কী কী প্রশ্ন জেগেছে? তার অন্তত পাঁচটি প্রশ্ন খাতায় লেখো।

১১. নীচে একটি টাইমটেবিলের অংশ (নমুনা হিসেবে) তোমাদের জন্য দেওয়া রইল। সেখান থেকে বিভিন্ন ট্রেনের নম্বর, কোথা থেকে ছাড়ছে, গন্তব্যস্থলটি কোথায়, বিভিন্ন স্টেশনে ট্রেনের পৌঁছোনোর সময় ইত্যাদি তোমার খাতায় নথিভুক্ত করো। (প্রয়োজনে শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্য নাও)।

শেওড়াফুলি - তারকেশ্বর আপ

স্টেশন ↓		৩৭৩৬৫#	৩৭৪১১*	৩৭৩১১	৩৭৩৯৩	৩৭৩১৩	৩৭৩৬৭#	
হাওড়া	ছাঃ	০৪ ২২	— —	০৫ ১০	০৫ ৩২	০৫ ৫৫	০৬ ৩২	
শেওড়াফুলি জং	**ছাঃ**	০৫ ০৩	০৫ ১৫	০৫ ৪৮	০৬ ১১	০৬ ৩৩	০৭ ১০	
দিয়ারা	ছাঃ	০৫ ০৮	০৫ ২০	০৫ ৫৩	০৬ ১৬	০৬ ৩৮	০৭ ১৫	
নসিবপুর	ছাঃ	০৫ ১১	০৫ ২৩	০৫ ৫৬	০৬ ১৯	০৬ ৪১	০৭ ১৮	
সিঙ্গুর	ছাঃ	০৫ ১৬	০৫ ২৮	০৬ ০১	০৬ ৩০	০৬ ৪৬	০৭ ২৩	
কামারকুণ্ডু জং	**ছাঃ**	০৫ ২১	০৫ ৩৩	০৬ ০৬	— —	০৬ ৫১	০৭ ২৮	
নালিকুল	ছাঃ	০৫ ২৫	০৫ ৩৭	০৬ ১০		০৬ ৫৫	০৭ ৩২	
মালিয়া	ছাঃ	০৫ ২৯	০৫ ৪১	০৬ ১৪		০৬ ৫৯	০৭ ৩৬	
হরিপাল	ছাঃ	০৫ ৩১	০৫ ৪৩	০৬ ১৬		০৭ ০১	০৭ ৩৮	
কৈকালা	ছাঃ	০৫ ৩৫	০৫ ৪৭	০৬ ২০		০৭ ০৫	০৭ ৪২	
বাহিরখণ্ড	ছাঃ	০৫ ৩৯	০৫ ৫১	০৬ ২৪		০৭ ০৯	০৭ ৪৬	
লোকনাথ	ছাঃ	০৫ ৪৪	০৫ ৫৬	০৬ ২৯		০৭ ১৪	০৭ ৫১	
		০৫ ৪৯	০৬ ০৬	০৬ ৪৪		০৭ ২৫	০৮ ০৭	
তারকেশ্বর	**পৌঃ**	০৫ ৫১	— —	— —		— —	০৮ ১৭	

তারকেশ্বর - শেওড়াফুলি জং ডাউন

স্টেশন ↓		৩৭৩২০	৩৭৩৮৬	৩৭৩২২	৩৭৩৬৮#	৩৭৩২৪	৩৭৩২৬	৩৭৩২৮	
তারকেশ্বর	ছাঃ	— —		— —	০৮ ৫৬	— —	— —	— —	
	ছাঃ	০৭ ৫০		০৮ ২৫	০৯ ২৩	০৯ ৪৫	১০ ১৯	১১ ০৫	
লোকনাথ	ছাঃ	০৭ ৫৩		০৮ ২৮	০৯ ২৬	০৯ ৪৮	১০ ২২	১১ ০৮	
বাহিরখন্ড	ছাঃ	০৭ ৫৮		০৮ ৩৩	০৯ ৩১	০৯ ৫৩	১০ ২৭	১১ ১৩	
কৈকালা	ছাঃ	০৮ ০২	— —	০৮ ৩৭	০৯ ৩৫	০৯ ৫৭	১০ ৩১	১১ ১৭	
হরিপাল	ছাঃ	০৮ ০৬	০৮ ২৫	০৮ ৪২	০৯ ৩৯	১০ ০১	১০ ৩৫	১১ ২১	
মালিয়া	ছাঃ	০৮ ০৯	০৮ ২৮	০৮ ৪৫	০৯ ৪২	১০ ০৪	১০ ৩৮	১১ ২৪	
নালিকুল	ছাঃ	০৮ ১২	০৮ ৩১	০৮ ৪৮	০৯ ৪৫	১০ ০৭	১০ ৪১	১১ ২৭	
		০৮ ১৭	০৮ ৩৬	০৮ ৫৪	০৯ ৫০	১০ ১২	১০ ৪৬	১১ ৩২	
কামারকুণ্ডু জং	ছাঃ	০৮ ২৫	০৮ ৩৯	০৮ ৫৭	০৯ ৫৩	১০ ১৫	১০ ৪৯	১১ ৩৫	
সিঙ্গুর	ছাঃ	০৮ ৩০	০৮ ৪৪	০৯ ০১	০৯ ৫৮	১০ ২০	১০ ৫৪	১১ ৪০	
নসিবপুর	ছাঃ	০৮ ৩৩	০৮ ৫০	০৯ ০৯	১০ ০১	১০ ২৩	১০ ৫৭	১১ ৪৩	
দিয়ারা	ছাঃ	০৮ ৪৫	০৯ ০৭	০৯ ২৩	১০ ২০	১০ ৪৪	১১ ১৬	১২ ০৪	
শেওড়াফুলি জং	পৌঃ	০৯ ২৩	০৯ ৪৮	১০ ০২	১১ ০২	১১ ২৭	১১ ৫৮	১২ ৪৭	

বনের খবর

প্রমদারঞ্জন রায়

লুশাই পাহাড়ের যে জায়গায় আমার কাজ ছিল সে বড়ো ভয়ংকর জায়গা। সাড়ে-ছশো সাতশো বর্গমাইল জায়গা, তার মধ্যে একটা গ্রাম নেই, পথ নেই। সঙ্গে প্রায় ষাটজন লোক, জিনিসপত্র। খোরাক ইত্যাদিও ঢের। সেসব বইবার জন্য দুটো হাতিও আছে।

দশ-বারোজন লুশাই বন কেটে পথ করে আগে আগে চলে, তবে আর সবাই এগোতে পারে। অত করেও, অত মেহনতের পরও একদিনে চার-পাঁচ মাইলের বেশি অগ্রসর হওয়া যায় না। সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন তাঁবু পড়ে, তখন কারো হাত-পা যেন চলতে চায় না। তার উপর আবার পাহারা দিতে হয়।

সে ঘোর বনে মানুষের নামগন্ধ নেই, শুধু জানোয়ারের কিলিবিলি! সন্ধ্যার পর পা ফেলতে গেলে মনে হয় এই বুঝি বাঘই মাড়ালাম।

বেলা নটা-দশটার আগে আর সূর্য দেখা যায় না। এক-এক জায়গায় এমনি ঘন বন যে আকাশ দেখবার জো নেই, ঠিক মনে হয় যেন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আমি সকলের আগে আগে চলি, সঙ্গে

একজন বুড়ো লুশাই থাকে, সে বড়ো শিকারি। তার পিছনে দুজন খালাসি, তাদের মধ্যে শ্যামলালের হাতে আমার দূরবিন, বন্দুক আর টোটার থলে, অন্যজনের হাতে আমার খাবার আর জল। তিনজনের হাতেই এক-একখানি দা।

আমরা চারজনে গাছে দাগ কেটে অন্য সকলের আধ মাইল বা কিছু বেশি আগে আগে যাই, আর সেই দাগ দেখে লুশাই কুলিরা বন কেটে পথ তৈরি করে, হাতি আর বাকি লোকদের নিয়ে আসে। রোজই এমনি করে চলতে হয়। একদিন পনেরো-কুড়ি ফুট চওড়া একটা বুনো হাতিদের রাস্তা পাওয়া গেল, লোকজনদের খুব মজা, বন কাটতে হচ্ছে না।

চলতে-চলতে এক জায়গায় দেখলাম পথের উপর প্রকাণ্ড গাছ পড়ে রয়েছে। দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম আমাদের হাতি দুটো এ-গাছ ডিঙোবে কী করে? ভাবতে-ভাবতে গাছটার উপর চড়তে আরম্ভ করলাম, আর অমনি আমার পায়ের নীচেই যেন একটা কী হুড়মুড় করে উঠল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেয়া হ্যায় রে?' শ্যামলাল বললে, 'হুল্লুমান হোগা হুজুর।'

বলতে-না-বলতে সেটা গাছপালা ভেঙে কামানের গোলার মতো বেরিয়ে এল—গন্ডার! এক নজর আমাদের দিকে দেখেই 'ঘোঁৎ' বলে দৌড় দিল। আমি পিছনের দিকে হাত বাড়িয়ে রয়েছি শ্যামলাল বন্দুক দেবে, কিন্তু কোথায় শ্যামলাল! সে ততক্ষণে প্রাণ বাঁচাবার সোজা পথ খুঁজছে। গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে, শ্যামলালের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে, টোটা ভরে, গন্ডার মারতে ছুটলাম, কিন্তু ততক্ষণে গন্ডার কোথায় যে গা ঢাকা দিয়েছে, আর তাকে খুঁজে পেলাম না।

পরদিন খুব ভোরে উঠে চলতে আরম্ভ করেছি। আজকের পথ নালায়-নালায়, সঙ্গে বুড়ো লুশাই আর শ্যামলাল। ভোরবেলা নানারকম শিকার পাওয়া যায়, সেইজন্য বন্দুক ভরে নিয়েই চলেছি। শিকার সামনে পড়ছে কিন্তু মারতে পারছি না, একে ঘোর বন, তায় কুয়াশা। শিকার দেখতে-না দেখতে জঙ্গলে মিলিয়ে যায়। হাতি, গন্ডার, বাঘ, হরিণ, সকলেরই তাজা পাঞ্জা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। পাখিরও অভাব নেই, গোটা দুই ফেজেন্ট মেরেছি। হাতির পথ ধরে, নালাটাকে কখনো এপার কখনও ওপার করতে করতে পাকোয়া নদীর দিকে চলেছি, আজ রাত্রে সেখানে ক্যাম্প করব।

একটা শুকনো নালা সামনে পড়েছে, আমরা তার মধ্যে নামলাম, লুশাই বুড়ো আমার আগে আর শ্যামলাল পিছনে। শ্যামলাল তখনও নালার ভিতর নামেনি, আমরা নালা পার হয়ে উপরে উঠতে যাব, এমন সময় আমাদের সামনেই ভারী একটা জল-কাদা তোলপাড়ের শব্দ হলো। নিশ্চয় বুঝতে পারলাম হাতি, গন্ডার বা বুনো মোষ হবে, কাদায় লুকিয়ে আয়েস করছিল, আমাদের সাড়া পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আমরাও তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যস্ত হয়ে, দুই লাফে নালার যে পার থেকে নেমেছিলাম সেখানে উঠে ফিরে চেয়ে দেখলাম ব্যাপারখানা কী। ব্যাপার গুরুতর! বিশাল-দেহ এক গন্ডার, যমদূতের

দাদামশায়ের মতো, দাঁড়িয়ে ফোঁস-ফোঁস করছে। লাল দুটো চোখ মিটমিট করছে, কান দুটো পিছন দিকে হেলানো। আমার পকেটে তিনটি মাত্র গুলিওয়ালা টোটা, মাঝে ফুট পনেরো চওড়া নালা, ওপারে গন্ডার, শ্যামলাল পালিয়েছে।

লুশাইটি ক্রমাগত বলছে, 'মারো সাহেব!' তার মুখে দাখানা, পা তুলে দিয়েছে গাছের গোড়ায়, বেগতিক দেখলেই বাঁদরের মতো চড়ে যাবে। আমি কী করব? সেই ছেলেবেলায় গাছে চড়তাম এখন সে বিদ্যা একেবারেই ভুলে গেছি, তার উপর পায়ে বুট! কাজেই ধীরে-ধীরে বন্দুকে গুলি ভরে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। গন্ডার যদি নালা পার হয়ে এপারে আসতে চায় তবেই গুলি চালাব, নইলে চালাব না।

লুশাই খালি বলছে 'মারো, মারো', কিন্তু তিনটি মাত্র গুলি সম্বল নিয়ে, গন্ডার মারতে গিয়ে শেষে কি প্রাণটা হারাব?

যাইহোক, আমাকেও গুলি চালাতে হলো না, লুশাই বুড়োকেও গাছে চড়তে হলো না, গন্ডারটা মিনিটখানেক পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থেকে, একটা হুংকার দিয়ে, দৌড়ে পাহাড়ে উঠে গেল। তার সামনে যত বাঁশ পড়ল, সমস্ত প্যাঁকাটির মতো পটপট করে ভেঙে গেল।

তখন আমরাও আস্তে আস্তে চলতে লাগলাম। আধ মাইলও যাইনি, আবার সামনে ভীষণ হুড়োমুড়ি! তারপর মড়মড় করে বাঁশ ভাঙার শব্দ। তারপর, উঃ কী ভীষণ গর্জন! সারা বন থরথর করে কেঁপে উঠল। এবার একটু বেকায়দা, লুশাই বুড়োর আশে-পাশে গাছ নেই, কীসে চড়বে? শ্যামলাল হতভাগা ইতিমধ্যে এসে জুটেছে, টোটার থলে থেকে আট-দশটা গুলিভরা টোটা নিয়ে ইতিপূর্বেই পকেটে পুরেছি।

পথ ছেড়ে দিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে বন্দুক হাতে দাঁড়ালাম। দাঁতওয়ালা হাতি, হয় পাগল তা না হয় অন্য কোনো জানোয়ার দেখেছে। লুশাই বলল, 'বোধহয় সেই গন্ডারটা ওর সামনে পড়েছে।'

হাতিটা কিন্তু আমাদের দিকে এল না, তিন-চারটে ডাক দিয়ে, ধীরে-ধীরে বাঁশ ভাঙতে-ভাঙতে পাহাড়ে উঠল। আমরাও চলতে লাগলাম।

আমরা পাকোয়া নদীর কিনারায় পৌঁছোলাম। নদীটা সত্তর-আশি হাত চওড়া হবে, তাতে এক কোমর জল। নদীর ধারে হাতির পায়ের তাজা দাগ। একটার পিছনে একটা, তার পিছনে একটা, এমনি করে এক পাল হাতি গেছে। পায়ের দাগ দেখে আমি বললাম, 'পাঁচ-সাতটা হাতি হবে।'

লুশাই বুড়ো ভালো করে দেখে বলল, 'চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটার কম নয়। ঠিক দাগে-দাগে পা ফেলে গেছে বলে বোঝা যাচ্ছে না।'

সারাদিন জলে-জলে চলে আমার কাপড়-চোপড় সব ভিজে গিয়েছিল। আমি পাহাড়ে হেলান দিয়ে বসে জুতো-মোজা খুলতে আরম্ভ করলাম। লুশাইকে বললাম, 'ওপারে গিয়ে তাঁবুর জায়গা দেখো।'

লুশাই ওপারে চলে গেল, শ্যামলালও বন্দুক তার সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। আমি বসে-বসে 'হুঁ-উ-উ' করে পিছনের লোকদের ডাকতে বললাম, খাবারওয়ালা খালাসি তাদের সঙ্গে, আমার বেজায় খিদে পেয়েছে।

বার দুই 'হুঁ-উ-উ' করে চেঁচিয়েছি, অমনি আমার উপরের একটা পাহাড় থেকে একটা হাতি 'হুঁ-উ-উ' বলে ডেকে উঠল, আর আমার ওখান থেকে পঞ্চাশ-ষাট হাত দূরে আরও অনেক হাতি গুড়গুড় শব্দ করে তার জবাব দিতে লাগল। আমি আবার চেঁচালাম, হাতিগুলোও আবার ঠিক তেমনি করল। আবার চেঁচালাম, আবার তাই হলো। একটা হাতি পাহাড়ের উপর 'হুঁ-উ-উ' করে, আর বাকিগুলো নালার কিনারা থেকে গুড়গুড় শব্দ করে আর নাকে ফোঁসফোঁস আওয়াজ করে।

এমন সময় আমার মাথার উপর থেকে মড়মড় করে বাঁশ ভাঙবার আওয়াজ হতে লাগল আর নদীর ওপার থেকে শ্যামলাল আর লুশাই বুড়ো ব্যস্ত হয়ে আমাকে ডাকতে লাগল, 'চলে এসো'। তিন-চারটে হাতি আমার চিৎকার শুনে দেখতে আসছে এ কী রকম জানোয়ারের ডাক, আমার মাথা থেকে বোধহয় ১০০-১২৫ গজ উঁচু পর্যন্ত নেমে এসেছে।

আমি তাড়াতাড়ি নদীর ওপারে গিয়ে, শ্যামলালের হাত থেকে বন্দুক নিয়ে নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। শ্যামলাল আর লুশাই বুড়ো খুব হল্লা জুড়ে দিল, তাই শুনে হাতিগুলো আবার পাহাড়ের উপর উঠে গেল। তারপর অনেকক্ষণ নদীর ধারে দাঁড়িয়ে রইলাম, হাতি আর দেখতে পেলাম না, তবে ক্রমাগতই আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম আর নদীর জল ঘোলাটে হয়ে উঠছিল।

চারটে সাড়ে-চারটের সময় অন্য লোকজন এসে পৌঁছোল। নদীর ওপারে বন কেটে তাঁবু খাটানো হলো, খুব বড়ো-বড়ো ধুনি আর পাহারার বন্দোবস্ত করা হলো। আগেই বলেছি আমাদের সঙ্গে দুটো হাতি ছিল, মাহুতরা রোজ তাদের চরে খাবার জন্য বনে ছেড়ে দেয়, সেদিন কিন্তু তাঁবুর কাছে বেঁধে রাখল। ছেড়ে দিলে বুনো হাতিতে এ-দুটোকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে, নয়তো মেরে ফেলবে। লুশাইরা শুকনো বাঁশের মশাল তৈরি করে, লম্বা লম্বা কাঁচা বাঁশের আগায় বেঁধে রাখল। রাত্রে হাতি এলে ওই মশাল জ্বেলে, তার লম্বা বাঁশের বাঁট ধরে ঘুরিয়ে হাতি তাড়াবে। এমনি করে লুশাইরা তাদের ক্ষেত থেকে হাতি তাড়ায়।

সে রাত্রে আর হাতির জ্বালায় ঘুম হয়নি। অন্ধকার হতেই হাতিগুলো আমাদের কাছে এল, আর বোধহয় ধুনির আলোতে আমাদের হাতি দুটোকে দেখতে পেয়ে তাদের ভারি খটকা লাগল, ও-দুটো আবার ওখানে কী করছে! পাঁচ-সাতটা হাতি মিলে এপারে আসবার জন্য এক-একবার নদীতে নামে, তারা নদীর মাঝামাঝি আসতে-না-আসতেই আমাদের হাতি দুটো ছটফট করে আর চিৎকার করতে আরম্ভ করে। অমনি আমাদের লোকরাও প্রাণপণে মশাল ঘুরিয়ে বিকট চিৎকার করতে-করতে ছুটে আসে আর হাতিগুলো দৌড়ে আবার ওপারের বনে ঢোকে। সারাটা রাত এইভাবে কাটল। ভোরবেলা কতকগুলো হাতি পুবের পাহাড়ে আর কতকগুলো পশ্চিমের পাহাড়ে উঠে গেল।

হাতে কলমে

প্রমদারঞ্জন রায় (১৮৭৪–১৯৪৯) : জন্ম ময়মনসিংহের মসুয়ায়। পিতা কালিনাথ রায়। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পাঠ অসম্পূর্ণ রেখেই ভারতীয় জরিপ বিভাগের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে অফিসার পদে চাকরি পান। কর্মজীবনের অধিকাংশ সময়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভারত, বর্মা, শ্যামদেশের ঘন জঙ্গলে ঘুরেছেন। *বনের খবর* বইতে তাঁর চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতার কথা রয়েছে। তিনি স্বনামধন্য লেখিকা লীলা মজুমদারের পিতা এবং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর অনুজ।

১. প্রমদারঞ্জন রায় চাকরি সূত্রে কোন কোন দেশে ঘুরেছেন?

২. লীলা মজুমদার তাঁর কে ছিলেন?

৩. **বর্ণ বিশ্লেষণ করো :**

ক্রমাগত, পাঞ্জা, পশ্চিম, কিলিবিলি, প্রাণপণ।

৪. **'বনের খবর গল্পটিতে এমন অনেক শব্দ আছে যা হাইফেন (–) দিয়ে যুক্ত। যেমন 'সাড়ে ছশো-সাতশো 'দশ -বারোজন' ইত্যাদি। গল্পটিতে এরকম কতগুলো শব্দ আছে খুঁজে বার করে নীচের বাক্সটি ভরতি করো :**

৫. **ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি ব্যবহার করে মৌলিক বাক্যরচনা করো :**

কিলিবিলি, হুড়মুড়, মিটমিট, পটপট, মড়মড়, থরথর, গুড়গুড়, ফোঁসফোঁস

৬. **একই শব্দ পরপর দু-বার ব্যবহৃত হয়েছে এমন কয়টি শব্দ তোমরা গল্পে খুঁজে পেয়েছ তা লেখো :**

যেমন — *জলে-জলে*।

শব্দার্থ : বর্গমাইল — বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ক্ষেত্রফল মাপার একটি একক। খোরাক — খাদ্যদ্রব্য। মেহনত — পরিশ্রম। হুল্লুমান — 'হনুমান' শব্দটির রূপভেদ। পাঞ্জা — পাঁচ আঙুলসমেত করতল। ধুনি — অগ্নিকুণ্ড। খটকা — সন্দেহ, সংশয়।

৭. **নীচের অনুচ্ছেদে কয়টি বাক্য আছে লেখো :**

বেলা নটা - দশটার আগে আর সূর্য দেখা যায় না এক এক জায়গায় এমনি ঘন বন যে আকাশ দেখবার জো নেই ঠিক মনে হয় যেন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে আমি সকলের আগে আগে চলি সঙ্গে একজন বুড়ো লুশাই থাকে সে বড়ো শিকারি তার পিছনে দু-জন খালাসি তাদের মধ্যে শ্যামলালের হাতে আমার খাবার আর জল তিনজনের হাতেই এক এক খানি দা।

৮. গল্পটিতে কোন কোন পশু-পাখির উল্লেখ আছে তার একটি তালিকা তৈরি করো। প্রতিটি পশু এবং পাখি সম্পর্কে দুটি করে বাক্য লেখো :

৯. **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

৯.১ লুশাই পাহাড়ের বিস্তার কতখানি জায়গা নিয়ে?

৯.২ লুশাই পাহাড়কে ভয়ংকর জায়গা কেন বলা হয়েছে?

৯.৩ হাতির রাস্তা পাওয়া গেলে লোকজনের কেন খুব মজা হলো?

৯.৪ গন্ডার দেখে শ্যামলাল কী কী করেছিল?

৯.৫ দ্বিতীয় দিন বন্দুক এবং বনের পশুপাখি থাকা সত্ত্বেও শিকার করতে পারা যায় নি কেন?

৯.৬ পাকোয়া নদীর বর্ণনা দাও।

৯.৭ লেখকের হুঁ-উ-উ চিৎকার শুনে হাতিরা কী করেছিল?

৯.৮ রাতে কোথায় তাঁবু খাটানো হলো?

৯.৯ মাহুতরা রাতে কোথায় হাতিদের বেঁধে রাখল?

১০. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তব নিজের ভাষায় লেখো :**

১০.১ কীভাবে রাতে বুনো হাতি তাড়ানো হলো?

১০.২ লেখকের শুকনো নালায় নামার অভিজ্ঞতা নিজের ভাষায় লেখো।

জেনে রাখো :

একসময় পশুশিকার যেমন মানুষের শখ ছিল, তেমনই নগরায়ণের প্রয়োজনে কিংবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে রেল-সড়ক প্রভৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রাণ বাঁচাতে মানুষকে পশুপাখি শিকার করতে হয়েছে। পাঠ্যের লেখক জরিপের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে জীবিকার প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় শিকার করতে বাধ্য হয়েছেন। ১৯৭২ সালে ভারতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন তৈরি হয়। তখন থেকে যেকোনো রকমের পশুশিকার আইনত নিষিদ্ধ। কিন্তু শিকার কাহিনি সাহিত্যের একটি বিশেষ সংরূপ। যেমন ইংরেজিতে লেখা জিম করবেটের রচনা। ঠিক তেমনই বাংলায় প্রমদারঞ্জন রায়ের লেখা *বনের খবর।*

মিলিয়ে পড়ো পূর্ব পাঠে পড়েছ কর্মসূত্রে লেখকের দেশ-বিদেশের জঙ্গলের অভিজ্ঞতার কথা। এবার পড়ে দেখো দুঃসাহসিক অভিযাত্রী বিমল মুখার্জির সাইকেলে চড়ে পৃথিবী ভ্রমণের সূচনা-পর্বের অভিজ্ঞতার কথা।

দু-চাকায় দুনিয়া

বিমল মুখার্জি

আজ থেকে ঠিক বাহান্ন বছর আগে মা-বাবা-ভাই-বোন আত্মীয়-বন্ধু ও ঘর-বাড়ি ছেড়ে আরামহীন অনিশ্চিতের পথে বেরিয়ে পড়েছিলাম অজানাকে জানার ও অচেনাকে চেনার জন্য। সারা পৃথিবী ঘোরবার স্বপ্ন যা ছেলেবেলায় ভূগোল পড়বার সঙ্গে সঙ্গে নেশার মতো আমাকে আঁকড়ে ধরেছিল, ১৯২৬ সালের ১২ ডিসেম্বর, তার বাস্তব রূপ নেওয়ার পথের প্রথম পদক্ষেপ শুরু হলো। আমার বয়স তখন তেইশ, সঙ্গে তিন বন্ধু — অশোক মুখার্জি, আনন্দ মুখার্জি ও মণীন্দ্র ঘোষ। অশোক মুখার্জি আমাদের দলের নেতা। সাইকেল চারখানা আমাদের বাহন।

যাত্রা শুরু হলো কলকাতার টাউন হল থেকে। মহা আড়ম্বরে বিরাট এক জনসভার ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রথম ভারতীয় দল ভূপর্যটক হয়ে পথে বেরোবে, এই খবরটা বাঙালির মনে সেদিন এক বিপুল উদ্দীপনা ও উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল।

টাউন হলের বাইরে এসে দেখি সামনে বিরাট জনসমুদ্র।

রাত ৯টার সময় পৌঁছোলাম চন্দননগরে। পরদিন বর্ধমান যাবার কথা ঠিক হলো।

বারোটার সময় আবার শুরু হলো জিটি রোড ধরে বর্ধমানের দিকে এগোনো।

১৯২৬ সালে জি টি রোড অনেক চওড়া ছিল। মোরাম দিয়ে বাঁধানো রাস্তা। দু-ধারে বড়ো বড়ো গাছের ছায়া সারাদিন থাকত। গাছের নীচ দিয়ে গোরুর গাড়ির সার দু-দিকে চলত। ক্বচিৎ কখনও একটা মোটরগাড়ি দেখেছি। ট্রাকে মাল বহনের রীতি তখনও হয়নি।

সর্বত্র আদর-আপ্যায়নের ভিতর দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। মোগল সাম্রাজ্য কায়েমি হওয়ার আগে পাঠান বীর শেরশাহ কলকাতা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত ১৫০০ মাইল লম্বা এক চওড়া রাস্তা — গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড তৈরি করেছিলেন। অফুরন্ত ফলের গাছ তার দু-ধারে লাগানো। প্রত্যেক দশ মাইল অন্তর একটা পাকা কুয়ো বা ইঁদারা সংলগ্ন পান্থশালা। পঞ্চাশ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের জিটি রোডের পাশে যে কুয়ো ছিল আমরা তার সুগভীর ঠান্ডা জল খেয়ে আনন্দ লাভ করেছি।

আমরা জিটি রোড ছেড়ে রাঁচির পথ ধরলাম।

অশোক ও আনন্দ সম্পর্কে জ্যেঠতুতো-খুড়তুতো ভাই। ওদের আত্মীয়স্বজনের কাছে বিদায় নেওয়া উদ্দেশ্য ছিল।

রাঁচি ছেড়ে আমরা আবার জিটি রোডের দিকে এগোলাম, পালামৌ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। এদিকে কম লোক চলে — গাড়ি তো নেই। খয়ের গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এমন কোনো ছোটো-বড়ো জন্তু-জানোয়ার ছিল না যাদের এই জঙ্গলে দেখা যেত না। বাঘ, হরিণ, নীলগাই আশপাশেই ঘুরত। সব মিলে জঙ্গলটা অপূর্ব সুন্দর দেখাত। রাত্রে ক্লান্ত হয়ে একটা ইনস্পেকশন বাংলোতে উঠলাম। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই চৌকিদার তার বাড়িতে চলে গিয়েছিল। দোর খুলে ভিতরে ঢুকতে খুব বেগ পেতে হয়নি। আমাদের সঙ্গে অ্যাসিটিলিন আলো ছিল। তার সাহায্যে একটা ঘর সাফ করে নিয়ে আমাদের সঙ্গে যা খাবার ছিল তা শেষ করে শুয়ে পড়লাম।

ঘরের সামনে যে উঠোন ছিল গভীর রাত্রে সেখানে এক ব্যাঘ্র মহাশয় আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিলেন। আমরা দরজা ও জানালা একটু মজবুত করে আটকে চারজন চারদিকে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে থাকলাম। বাঘ বাড়িটা প্রদক্ষিণ করল, কখনও কখনও দেয়ালের ওপারে জানোয়ার এপারে আমরা। জানালার মধ্যে কোথাও ফাঁক খুঁজছিল বোধহয়, আঁচড়ের শব্দে তাই মনে হলো। একটু জোরে ধাক্কা মারলেই জানালার খিলসুদ্ধ উড়ে যেত। সৌভাগ্যক্রমে বাঘের সেরকম মতিগতি ছিল না, তবু একবার জানালার কাছে বাঘ আসা মাত্র অশোক ০.৪৫ পিস্তল থেকে একটা গুলি ছুড়ল, কী সাংঘাতিক আওয়াজ। বাঘের কানে তালা লাগাবার মতো শব্দ। বাকি রাতটুকু আর আমাদের জ্বালাতন

না করে বাঘ উঠোন দিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। চাঁদনি রাতের আলোতে দেখলাম বাঘের পুরুষ্ট দেহটা। আওয়াজে ভয় পেয়ে সেখান থেকে সরে পড়াই শ্রেয় মনে করেছিল। তবু আমাদের কারো ঘুম হলো না। ভোরবেলায় চৌকিদার এসে হাজির। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল বাঘটার গুলি লেগেছে কিনা। আমরা ভয় পাওয়াবার জন্য আওয়াজ করেছিলাম শুনে বলল বাঘটা নাকি রোজ রাতে বাংলোয় বেড়াতে আসে। দিনের বেলায় যখন সে দেখেছে তার কাছে তখন সম্বল মাত্র একটা লাঠি। মানুষ খেকো নয় বোধহয়। খাবারের খোঁজেই টহল দিয়ে যায়।

আমরা চা খেয়ে রওনা হলাম জঙ্গলের পথ ধরে যতক্ষণ না আবার জিটি রোডে এসে পড়লাম। বিহারের চওড়া রাস্তার দু-পাশে ধান ও গম কাটা তখন হয়ে গিয়েছে। এই সময় কী পরিমাণ ব্ল্যাক বাক ও স্পটেড ডিয়ার দলে দলে দু-ধারে দেখা যেত, আজকের দিনে তা গল্পকথা বলে মনে হবে। সারস পাখিরা মাঠের উপর খাবার খুঁজে খেত। একেকটা গাছ ভরতি ফ্লেমিঙ্গো — কখনো কখনো হেরন পাখিও দেখা যেত। সারাটা রাস্তাজুড়ে অগণিত ঘুঘু দেখা যেত। তার কারণ গোরুর গাড়ি ভরতি চাল-ডাল-গম নিয়ে যাওয়ার সময় ফুটো থলে দিয়ে বাইরে কিছু পড়ত।

এইরকম পশুপাখি সারা জিটি রোডে দেখতাম। উত্তরপ্রদেশে ময়ূর দেখেছি যেখানে সেখানে। কেউ তাদের মারত না—এত সুন্দর জীব বলে। আখের ক্ষেতের আশেপাশে মস্ত বড়ো নীলগাই ও ময়ূর, হরিণও অনেক দেখেছি।

বিচিত্র সাধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি যখন পাঠশালাতে যাই
আমাদের এই বাড়ির গলি দিয়ে,
দশটা বেলায় রোজ দেখতে পাই
ফেরিওলা যাচ্ছে ফেরি নিয়ে
'চুড়ি চা—ই, চুড়ি চাই' সে হাঁকে,
চিনের পুতুল ঝুড়িতে তার থাকে,
যায় সে চলে যে পথে তার খুশি,
যখন খুশি খায় সে বাড়ি গিয়ে।
দশটা বাজে, সাড়ে দশটা বাজে,
নাইকো তাড়া হয় বা পাছে দেরি।
ইচ্ছে করে সেলেট ফেলে দিয়ে
অম্‌নি করে বেড়াই নিয়ে ফেরি॥

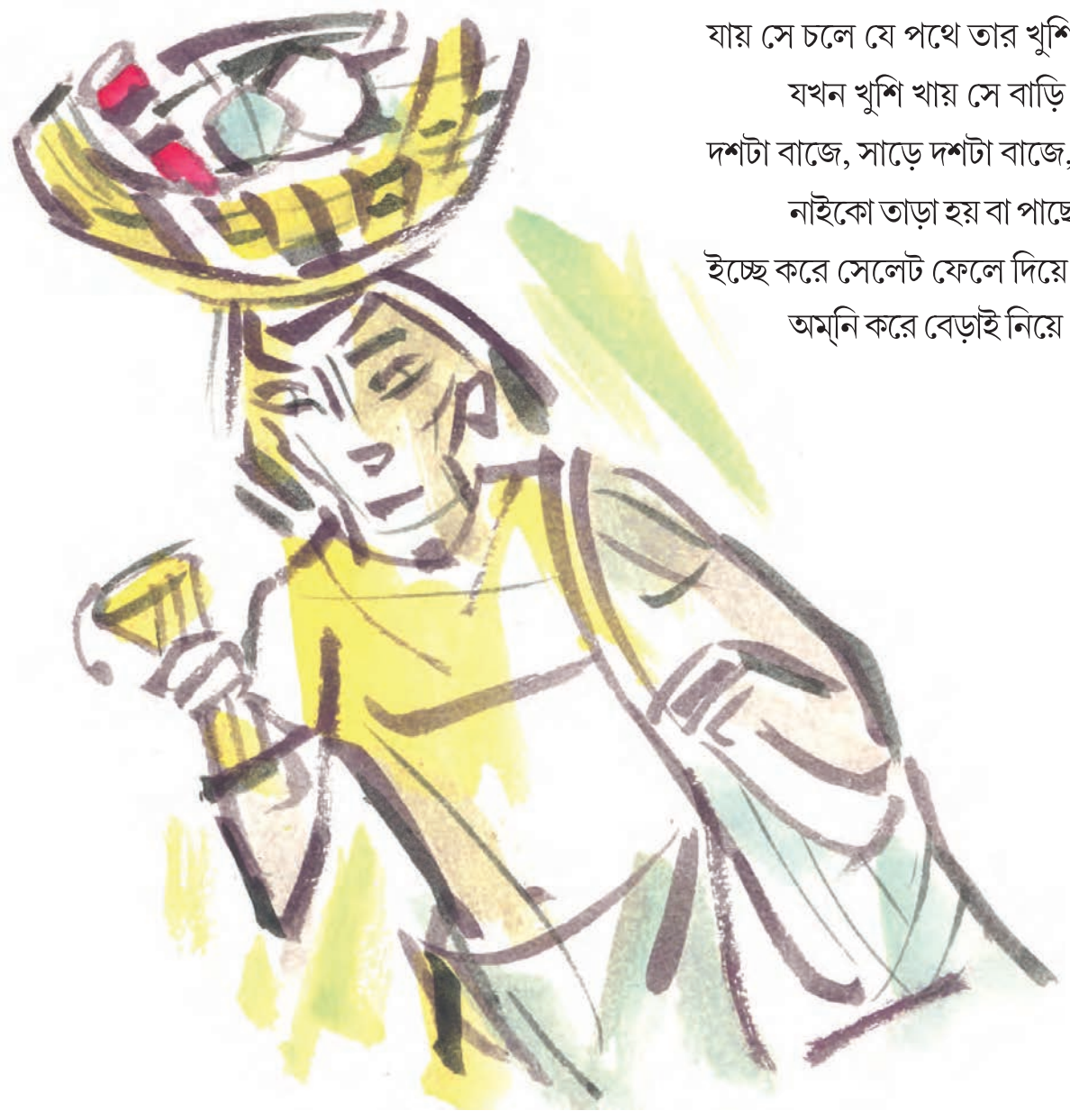

আমি যখন হাতে মেখে কালি
ঘরে ফিরি, সাড়ে চারটে বাজে,
কোদাল নিয়ে মাটি কোপায় মালি
বাবুদের ওই ফুল-বাগানের মাঝে।
কেউ তো তারে মানা নাহি করে
কোদাল পাছে পড়ে পায়ের পরে।
গায়ে মাথায় লাগছে কত ধুলো,
কেউ তো এসে বকে না তার কাজে।
মা তারে তো পরায় না সাফ জামা,
ধুয়ে দিতে চায় না ধুলোবালি।
ইচ্ছে করে, আমি হতেম যদি
বাবুদের ওই ফুল-বাগানের মালি।।

একটু বেশি রাত না হতে হতে
মা আমারে ঘুম পাড়াতে চায়,
জানলা দিয়ে দেখি চেয়ে পথে
পাগড়ি পরে পাহারওলা যায়।
আঁধার গলি, লোক বেশি না চলে,
গ্যাসের আলো মিট্‌মিটিয়ে জ্বলে,
লণ্ঠনটি ঝুলিয়ে নিয়ে হাতে
দাঁড়িয়ে থাকে বাড়ির দরোজায়।
রাত হয়ে যায় দশটা-এগারোটা
কেউ তো কিছু বলে না তার লাগি।
ইচ্ছে করে পাহারওলা হয়ে
গলির ধারে আপন মনে জাগি।।

হাতে কলমে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। অল্পবয়স থেকেই ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত *ভারতী* ও *বালক* পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। *কথা ও কাহিনী, সহজপাঠ, রাজর্ষি, ছেলেবেলা, শিশু, শিশু ভোলানাথ, হাস্যকৌতুক, ডাকঘর, গল্পগুচ্ছ* - সহ তাঁর বহু রচনাই শিশু-কিশোরদের আকৃষ্ট করে। দীর্ঘ জীবনে অজস্র কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। এশিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম নোবেল পুরস্কার পান ১৯১৩ সালে 'Song Offerings'- এর জন্যে। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত আর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা। পাঠ্যাংশটি তাঁর *শিশু* নামক বই থেকে নেওয়া হয়েছে ।

১. সহজপাঠ বইটির লেখকের নাম কী?

২. কবি রবীন্দ্রনাথ কত সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান?

৩. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৩.১ 'পাঠশালা' শব্দটির একটি সমার্থক শব্দ লেখো।

৩.২ কবিতার কথক বাড়ির গলি দিয়ে কোথায় যায়?

৩.৩ পাঠশালায় যাওয়ার পথে কথকের মনে কোন কল্পনা জেগে ওঠে?

৩.৪ সারাদিনের শেষে বাড়ি ফেরার পথে সে কী দেখতে পায়?

৩.৫ 'ফেরিওলা' 'মালি' কিংবা 'পাহারওলা'-র জীবনের স্বাধীনতা কথককে কীভাবে আকর্ষণ করে?

৩.৬ রাতের বেলা জানলা দিয়ে বক্তা কাকে দেখে?

৪. **তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৪.১ মালির জীবনের সঙ্গে বক্তার নিজের জীবনের অমিলগুলি কী?

৪.২ ফেরিওলার জীবনের কোন বিষয়গুলি বক্তাকে আকর্ষণ করে?

৪.৩ বক্তার দৃষ্টি অনুযায়ী রাতের দৃশ্য বর্ণনা করো।

৩.৭ কবিতায় কথকের নানরকম সাধের যে পরিচয় পাও তা উল্লেখ করো।

৫. **বাক্যরচনা করো :** কোদাল, পাগড়ি, গলি, খুশি, ফেরিওলা

৬. এই কবিতায় এক শিশুর অনেক সাধের কথা আছে। তেমনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই লেখা যে কবিতায় ফুল, প্রদীপের আলো, পুকুরের জল এদের সাধের কথা আছে সেই কবিতাটির বিষয়ে নিজের ভাষায় ছয়টি বাক্য লেখো। এখানে প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

৭. **'ওলা / ওয়ালা' যোগে পাঁচটি শব্দ তৈরি করো : যেমন — 'ফেরিওলা', 'বাঁশিওয়ালা'।**

শব্দার্থ : ফেরি — পথে ঘুরে জিনিস বিক্রয়। সেলেট — ‘শ্লেট’-এর কোমল রূপ। মানা — বারণ/নিষেধ। সাফ — পরিষ্কার। পাঠশালা — বিদ্যালয়। গলি — সরু রাস্তা। পাগড়ি— মাথায় জড়াবার কাপড়। কোপায়— কোপ দিয়ে কাটে। মালি— বাগানের গাছ-পালার পরিচর্যাকারী।

৮. **সূত্র অনুযায়ী শব্দছকটি পূরণ করো :**

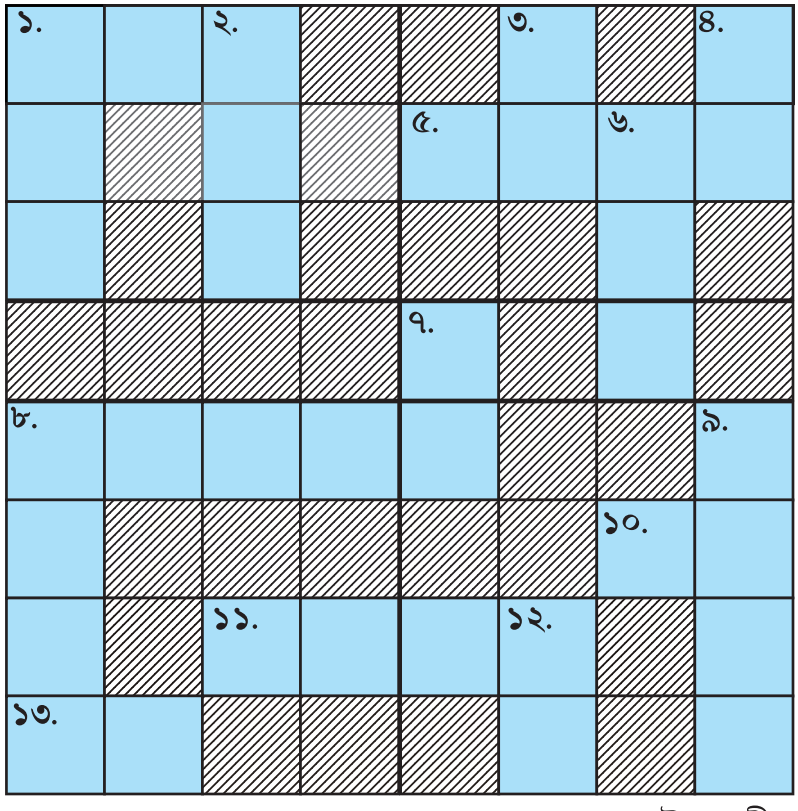

পাশাপাশি

১। মাটি কাটার উপকরণ

৫। ঘরের ____ মাঝে মাঝে ঝাড়তে হয়

৮। যে পাহারা দেয়

১০। বিলম্ব

১১। পরিষ্কার পোশাক

১৩। জন্য

উপর-নীচ

১। মাটি কাটে

২। বাতি

৩। অন্ধকারকে দূর করে

৪। যে বাগানের কাজ করে

৬। উদ্যান

৭। এখন ____ ১২ টা

৮। বিদ্যালয়

৯। যে ফেরি করে বেড়ায়

১২। মৃত্তিকা

সমাধান:

পাশাপাশি : ১. কোদাল ৫. ধুলোবালি ৮. পাহারওলা ১০. দেরি ১১. সাফজামা ১৩. লাগি।

উপরনীচ : ১. কোপায় ২. লণ্ঠন ৩. আলো ৪. মালি ৬. বাগান ৭. বেলা ৮. পাঠশালা ৯. ফেরিওলা ১২. মাটি।

৯. **নীচের বাক্যগুলি থেকে কর্তা, কর্ম এবং ক্রিয়া নির্দিষ্ট স্থানে বসাও :**

৯.১ মা তারে তো পরায় না সাফজামা

৯.২ চিনের পুতুল ঝুড়িতে তার থাকে।

৯.৩ জানালা দিয়ে দেখি চেয়ে পথে।

৯.৪ ইচ্ছে করে পাহারাওয়ালা হয়ে গলির ধারে আপন মনে জাগি।

কর্তা	কর্ম	ক্রিয়া

১০. **কবিতার কথক কোন সময়ে কী কী ঘটতে দেখে তা লেখো। আর একই সঙ্গে ঠিক এই সময়গুলোতে তুমি কী করো এবং কী ঘটতে দেখো লেখো।**

১১. তুমি তোমার গ্রামে বা শহরে যে নানারকম জীবিকার মানুষদের দিনের বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ কাজ করতে দেখো তার একটি তালিকা তৈরি করো। জীবিকার প্রয়োজনে তাঁদের বিশেষ রকমের হাঁক-ডাক ও ভঙ্গিমা লক্ষ করে লেখো।

১২.

পরপর তিনটি ছবিতে
তিনজন কর্মরত মানুষের
কথা আছে। তোমার কী
হতে সাধ হয় এবং কেন, তা
ছবি দেখে নিজের ভাষায়
কয়েকটি বাক্যে লেখো।

চতুর্থ পাঠ

আমাজনের জঙ্গলে

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

এমন জঙ্গল, এমন নদী, এমন চাঁদ, এমন মানুষজন — কাকারা সঙ্গে থাকলে আমার তো দেখাই হতো না! আর কোনো দিন বাড়ি ফিরতে পারব কিনা সেই ভয়ানক দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও কী করে আমার কাকাদের কথাটা এভাবে মনে এল জানি না।

আমাদের একেবারে সামনের নৌকো থেকে ভারি সুরেলা বাজনা ভেসে আসছিল। হঠাৎ থেমে যেতেই উবা জলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বেশ খানিকটা জায়গায় সতর্ক চোখ বোলাতে লাগল।

দুয়েক মিনিটের মধ্যেই কাছে দূরে সব কটা নৌকোর গান-বাজনা থেমে গেল। আকাশে বিরাট চাঁদ, নীচে বিশাল নদী, মধ্যিখানে অদ্ভুত স্তব্ধতা।

সেই স্তব্ধতার মধ্যে উবার ফিশফিশ গলা শুনতে পেলাম — বোতো! বোতো!

তার বলার ভঙ্গি, চোখ-মুখের ভাব আর জলের দিকে আঙুল দেখানো থেকে বুঝলাম, উবা বলতে চাইছে বোতোকে দেখা যাচ্ছে!

বোতোর দেখা পাওয়া নাকি সবসময়ই ভালো, নৌকো উৎসবের রাতে দেখা পাওয়া খুবই সৌভাগ্যের লক্ষণ।

উবা আমাকে বুঝিয়ে দিল নৌকোয় নৌকোয় গান-বাজনা থেমে যাওয়া মানে সকলে এতক্ষণে বোতোর দেখা পাওয়ার কথা জেনে গেছে। একটা নৌকোয় গান-বাজনা থামলেই বাকিরা যারা যত আগে সেটা খেয়াল করবে তারা তত আগে তাদের নৌকোর গান-বাজনা থামাবে। এভাবে কোনো একটা নৌকো থেকে বোতোর দেখা পাওয়ার দুয়েক মিনিটের মধ্যেই সব নৌকোয় সেই সুখবর ছড়িয়ে যায়। তখন সকলেই গান-বাজনা থামিয়ে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে চারিদিক থেকে গোল হয়ে প্রথম নৌকোটার কাছে ফিরে আসতে থাকে।

অন্যদের আর কথা কী, আমি নিজেও বোতোকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলাম। বোতোই নাকি আমাজনের বিপদ-আপদে মানুষকে রক্ষা করে! জলের তলায় তার মস্ত শহর, সেখানে রঙিন পাথরে তৈরি তার বিরাট প্রাসাদ!

হঠাৎ উবার ইশারায় নদীর জলে তাকিয়ে দেখি, খুব লম্বা মতো একটা প্রাণী তিন-চার হাত জলের নীচে ধীরে ধীরে এঁকে বেঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে! তার নাক বা ঠোঁট খুব সরু, লম্বায় প্রায় এক-দেড় হাত। মস্ত বড়ো মাথা, এর মস্তিষ্ক মানুষের মস্তিষ্কের চেয়ে বড়ো হলে আশ্চর্যের কিছু নেই। এর ল্যাজটা শরীরের শেষ প্রান্ত থেকে দু-দিকে ভাগ হয়ে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। রংটা ঠিক লাল কী? মনে হলো যেন গোলাপির দিকেই।

যদি ডলফিন হয়, তাহলে পূর্ণিমা রাতে আমাজন নদীতে ডলফিন দেখাও তো ভাগ্যের কথা, ক-জনের সে ভাগ্য হয়? আর যদি আমাজনের দেবতা হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমার মনের কষ্ট আর প্রার্থনা বোতোর অজানা থাকবে না! জলের নীচে বোতোকে দেখতে দেখতে আমি মনে মনে বললাম, বোতো, তুমি কে, আমি জানি না। তুমি যদি সত্যিই আমাজনের রক্ষাকর্তা হও, তুমি আমাকে আমার মা বাবা আর স্কুলের বন্ধুদের কাছে ফিরে যাওয়ার উপায় করে দিও।

একটা ভারি আশ্চর্য ব্যাপার চারদিক থেকে অতগুলো নৌকো একেবারে কাছে এসে ঘিরে ধরেছে, তবু বোতোর কোনো রাগ ভয় বিরক্তি নেই, সে আপনমনে আনন্দে মশগুল হয়ে খুব ধীরে ধীরে জলের মাত্র তিন-চার হাত নীচে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কখনো কখনো জলের ওপরেও উঠে আসছে, সবসময়ই আনন্দে বিভোর, মনে হয় সে যেন তার মনের ভিতরের সুরে তালে ছন্দে লয়ে নেচে বেড়াচ্ছে।

জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে উবা একেকদিন হঠাৎই হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ে। তারপর আমাকেও বসতে বলে। তার গভীর চোখ দুটি আমার দু-চোখের ওপর মেলে রেখে অনেকক্ষণ ধরে কী দেখে সে-ই জানে। মাঝে মাঝে মনে হয় যেন আমার চোখের মধ্যে দিয়ে বহু দূরের কিছু সে দেখছে বা দেখবার চেষ্টা করছে।

বেশ কিছু দিন এরকম হওয়ার পর, একদিন সকালে উবা একইভাবে হাঁটু গেড়ে বসে আমার চোখে চোখ রেখে মাটির ওপর তার কাঠকুটোর ছবি তৈরি করতে লাগল।

ছবি দেখে আমি বুঝলাম, উবা আমার চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝতে চায়, আমি কে? জানতে চায় আমি কোথা থেকে এসেছি। কোন পৃথিবীর মানুষ আমি, সেই পৃথিবীটা কীরকম?

এ প্রশ্নের উত্তর আমি কীভাবে বোঝাব জানি না। ভাবলাম, যে কলকাতায় আমরা থাকি, সেই কলকাতার কথাই ওকে বলি। শেষপর্যন্ত অনেক ভেবে চিন্তে বেশ বড়ো দেখে একটা জায়গা পরিষ্কার করে খুব মন দিয়ে সেখানে একটা ছবি এঁকে যতটা পারি আমার কথা, আমার বাবা-মায়ের কথা, বন্ধুদের কথা, স্কুলের কথা, কলকাতা শহরের কথা, শহর ভরা ঘর-বাড়ি, গাড়ি-ঘোড়া, দোকানবাজার, লোকজনের কথা বোঝালাম। কলকাতা নামটাও তাকে বারকতক শুনিয়েছি।

উবা ওই মস্ত বড়ো ছবির ওপর ঝুঁকে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুরো ছবিটা দেখেই আবার তার কাঠকুটো সাজাতে লাগল। এই কাঠকুটো দিয়ে ছবি আঁকায় উবা ভারি ওস্তাদ। একপলক চোখ বুলিয়েই তার বলবার কথাটা আমি বুঝে নিলাম।

উবার মুখে কলকাতা কথাটা শুনে আমার এত আনন্দ হলো যে কী বলব! দুই ঠোঁট গোল করে জিভ নেড়ে অদ্ভুতভাবে শব্দটা উচ্চারণ করে আর ছবি দেখিয়ে ও বলল, 'কলকাতায় জঙ্গল নেই, পাখি নেই, প্রজাপতি নেই, বড়ো বড়ো নদনদী নেই, তুমি সেখানে থাকো কী করে? ও তো শুধু বালির দেশ!'

বালির দেশ অর্থাৎ মরুভূমি। কলকাতায় থাকতে, কই, একথা তো কখনও মনে হয়নি। এখন আমাজনের জঙ্গলে বসে উবার মুখে শুনে মনে হলো, সত্যিই তো, কলকাতায় ঘন সবুজ বনজঙ্গল, পাখি, প্রজাপতি এসব তো দেখা যায় না।

ভ্যানরিকশায়, অনেকটা টিনের বড়ো বাক্সের মতো দেখতে চারদিক বন্ধ গাড়িতে ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা গাদাগাদি করে বসে স্কুলে যাচ্ছে — সেই ছবিটা দেখে উবা আমার দিকে তাকাল। এই ছবিটার মানে সে একেবারেই বুঝতে পারেনি। টিনের দেয়ালে ছোটো ছোটো জানালার ফাঁক দিয়ে কেউ কেউ তার কচি মুখ তুলে বাইরেটা দেখতে দেখতে চলেছে, উবা সেই মুখের ওপর, অনেকক্ষণ ঝুঁকে রইল, তারপর মুখ তুলে আমার কাছে এই ছবিটার মানে জানতে চাইল।

আমাজনের জঙ্গলে স্কুল কী করে বোঝাব! আরও কয়েকটি ছবি এঁকে যতটা সম্ভব স্কুলের বিষয়ে বললাম। উবা বেশ খানিকক্ষণ আমার চোখে চোখ রেখে চুপ করে বসে বসে ভাবল। তারপর তার কাঠকুটোর ছবি দিয়ে বলল — জঙ্গলের গাছপালা ফুল ফল কীটপতঙ্গের সঙ্গে না থেকে, গ্রীষ্ম বর্ষা শীত বসন্ত না দেখে কলকাতায় বসে তুমি কী করে এই জগৎটাকে জানবে?

এর পরেই উবা হঠাৎ আমার একটা হাত নিজের দু-হাতে নিয়ে, আমার দু-চোখে তার সেই গভীর দু-চোখের দৃষ্টি রেখে মুখে কোনো শব্দ উচ্চারণ না করে বলল — তুমি আর ওই দেশে ফিরে যেও না।

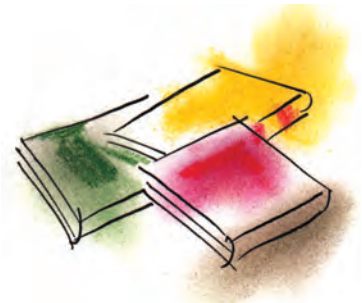

হাতেকলমে

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী (জন্ম ১৯৪১) : কবি, পর্যটক, পত্রিকা সম্পাদক, আলোকচিত্রী, তথ্যচিত্র নির্মাতা ছাড়াও অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর অন্যতম পরিচয় তিনি একজন জনপ্রিয় শিশুসাহিত্যিক। পৃথিবীর নানাদেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। নানা ভাষায় অনূদিত তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য — *শাদা ঘোড়া, আমাজনের জঙ্গলে, হীরু ডাকাত, গৌর যাযাবর, টিয়াগ্রামের ফিঙে নদী* ইত্যাদি। তাঁর সম্পাদিত পত্রপত্রিকার মধ্যে রয়েছে — *কালের কষ্টিপাথর, ছেলেবেলা, ভ্রমণ, কর্মক্ষেত্র* ইত্যাদি।

১. অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর লেখা দুটি বইয়ের নাম লেখো।

২. ভ্রমণ পত্রিকা ছাড়াও তিনি আর কোন পত্রিকার সম্পাদক?

৩. **ঠিক উত্তরের তলায় দাগ দাও।**

৩.১ লেখক গল্পটিতে যে জায়গার উল্লেখ করেছেন সেটি হলো (ইউক্রেন / আমাজন / সুন্দরবন)

৩.২ আমাদের একেবারে (পিছনের / সামনের / পাশের) নৌকা থেকে ভারি সুরেলা বাজনা ভেসে আসছিল।

৩.৩ কোনও একটা নৌকা থেকে বোতোর দেখা পাওয়ার (মিনিট দুয়েকের / মিনিট সাতেকের / মিনিট দশেকের) মধ্যেই সব নৌকায় সেই সুখবর ছড়িয়ে যায়।

৩.৪ (উবা / বোতো / টোবো) আমার চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝতে চায় আমি কে?

৩.৫ উবা (চকখড়ি /লতাপাতা/ কাঠকুটো) দিয়ে ছবি আঁকায় ভারি ওস্তাদ।

৪. 'গান বাজনা'-শব্দটির প্রথম অংশ 'গান' এবং দ্বিতীয় অংশ 'বাজনা' পরস্পরের পরিপূরক। নীচের শব্দগুলির পরে তাদের সমার্থক বা প্রায় সমার্থক অন্য শব্দ জুড়ে নতুন শব্দজোড় তৈরি করো :

লোক	ভাবনা	আশা	কাঠ
রোগ	ডাক্তার	হাঁক	ধন

৫. **নীচে কিছু কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কর্তার সাথে কর্ম ও ক্রিয়াকে মিলিয়ে ৫টি বাক্য লেখো :**

কর্তা	কর্ম	ক্রিয়া
আমি	প্রার্থনা	দেখো
উবা	ছবি	যাচ্ছে
বোতো	পাখি	দেখছে
সে	স্কুলে	করলাম
ছেলেমেয়েরা	আকাশে	আঁকছিল।

৬. **নীচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্যরচনা করো :**

ধীরে ধীরে, বসে বসে, আগে-আগে, হেঁটে-হেঁটে, জেগে-জেগে

শব্দার্থ : ব্যাকুল --- অস্থির। মস্তিষ্ক --- মগজ। কাঠকুটো --- কাঠের ছোটো ছোটো টুকরো। গাদাগাদি — ঘেঁষাঘেঁষি। কচি — নবীন।

৭. **গল্পের ঘটনা অনুযায়ী নীচের বাক্যগুলি পরপর সাজিয়ে লেখো :**

৭.১ বোতোকে দেখা গেছে।

৭.২ বোতোকে দেখার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলাম।

৭.৩ বোতো মনের ভেতরের সুরে তালে ছন্দে নেচে বেড়াচ্ছে।

৭.৪ একটা নৌকার গান বাজনা থেমে গেলে বাকিরা যারা যত আগে খেয়াল করবে তারা তত আগে তাদের নৌকার বাজনা থামাবে।

৭.৫ সামনের নৌকা থেকে সুরেলা বাজনা ভেসে আসছিল।

৮. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৮.১ লেখক কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলেন?

৮.২ লেখক কাকে বন্ধু হিসাবে পেয়েছিলেন?

৮.৩ জলের দেবতা বলে কাকে আমাজনের বাসিন্দারা মানে?

৮.৪ উবা কোন শহরকে বালির দেশ বলে বুঝিয়েছিল?

৮.৫ বালির দেশ — কথার অর্থ কী?

জেনে রাখো :

নদী আমাজন। ১৯৪১ সালে পর্যটক ওরেল্লানা এই নদীর নামকরণ করেন। আমাজন শব্দের অর্থ বীর রমণী। পৃথিবীর বৃহত্তম ও দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী আমাজন। ব্রাজিলের উত্তর ও মধ্য অংশ, পার্শ্ববর্তী কলম্বিয়া, বলিভিয়া, ভেনিজুয়েলা, ইকুয়েডর, পেরু প্রভৃতি দেশের অংশ-বিশেষ নিয়ে আমাজন অববাহিকা গড়ে উঠেছে। এত বড়ো নদী অববাহিকা পৃথিবীতে আর দেখা যায় না। আমাজন অববাহিকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, তাই বনভূমি চিরহরিৎ। এই বনভূমি শুধু গভীরতম অরণ্য নয়, নানা বৈচিত্র্যে ভরপুর। এই ধরনের বনভূমির নাম সেলভা।

এই দুর্ভেদ্য বনভূমিতে নানাপ্রকার হিংস্র পশু বাস করে। জাগুয়ার, বিশাল আনাকোনডা সাপ, রক্তচোষা বাদুড়, জোঁক, বিষাক্ত মাছি, বিষাক্ত মাংসাশী পিঁপড়ে আর জলে পিরান্‌হা মাছ, কুমির তো আছেই। জল ও স্থল উভয়ই ভয়ংকর।

৯. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৯.১ কাকাদের সঙ্গে না থাকাকে পাঠ্যাংশের আগন্তুক ছেলেটি সৌভাগ্যজনক মনে করেছে কেন?

৯.২ কোন উৎসবের কথা পাঠ্যাংশে রয়েছে? কীভাবেই বা সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে?

৯.৩ 'বোতো' সম্পর্কে আমাজন অঞ্চলে প্রচলিত বিশ্বাসটি কী? তার সম্বন্ধে সকলে কী কল্পনা করে?

৯.৪ গল্প কথকের চোখে দেখা 'বোতো'-র শারীরিক গঠনের পরিচয় দাও। তাকে দেখে আগন্তুক ছেলেটির কেমন লাগল?

৯.৫ যে রাতের ছবি পাঠ্যাংশে রয়েছে, তার বিশেষত্বটি কী, লেখো।

৯.৬ বোতোর কাছে আগন্তুক ছেলেটির নীরব প্রার্থনাটি কী ছিল?

৯.৭ ছবি এঁকে আগন্তুক ছেলেটি 'উবা'-কে কী বোঝাতে চেয়েছিল?

৯.৮ 'উবা'-র কলকাতা সম্বন্ধে কী ধারণা হলো?

৯.৯ কলকাতা সম্পর্কে 'উবা'-র ধারণাকে বদলে দিতে তুমি কী কী করতে চাও, লেখো।

৯.১০ কলকাতার আকর্ষণ ছাড়িয়ে দিতে 'উবা' যে জগতে আগন্তুক ছেলেটিকে আহ্বান জানিয়েছিল তার বর্ণনা দাও।

১০. **ঘটনার পাশাপাশি কারণ উল্লেখ করো :**

কারণ	ঘটনা
১)	১) সামনের নৌকো থেকে ভারি সুরেলা বাজনা ভেসে আসছিল।
২)	২) উবার ফিশফিশ গলায় শুনতে পেলাম— বোতো! বোতো!
৩)	৩) সকলেই গান বাজনা থামিয়ে যতটা সম্ভব নি:শব্দে চারদিক থেকে গোল হয়ে প্রথম নৌকোটার কাছে ফিরে আসতে থাকে।
৪)	৪) জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে উবা একেকদিন হঠাৎই হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ে।
৫)	৫) আরও কয়েকটি ছবি এঁকে যতটা সম্ভব স্কুলের বিষয়ে বললাম।

মিলিয়ে পড়ো

পূর্ব পাঠে উবা বলেছে কলকাতা *বালির দেশ*। কিন্তু গ্রাম শহর জঙ্গল নদী এই সবকিছু নিয়েই সভ্যতা বেঁচে থাকে। আমাদের সবার শুভবোধ ও *সত্যি চাওয়া*-র উপরেই তা নির্ভরশীল।

সত্যি চাওয়া

নরেশ গুহ

তোরা সত্যি যদি চাস,
আরও সবুজ হবে ঘাস
আরও মিষ্টি হবে জল
আরও স্বাদের হবে ফল
আরও সত্যি চাইলে পরে
আরও বাতাস গানে ভরে॥

আমি সাগর পাড়ি দেবো

কাজী নজরুল ইসলাম

আমি সাগর পাড়ি দেবো, আমি সওদাগর।
সাত সাগরে ভাসবে আমার সপ্ত মধুকর।
আমার ঘাটের সওদা নিয়ে যাব সবার ঘাটে,
চলবে আমার বেচাকেনা বিশ্বজোড়া হাটে।
ময়ূরপঙ্খি বজরা আমার 'লাল বাওটা' তুলে
ঢেউ-এর দোলায় মরাল সম চলবে দুলে দুলে।
সিন্ধু আমার বন্ধু হয়ে রতন মানিক তার
আমার তরি বোঝাই করে দেবে উপহার।

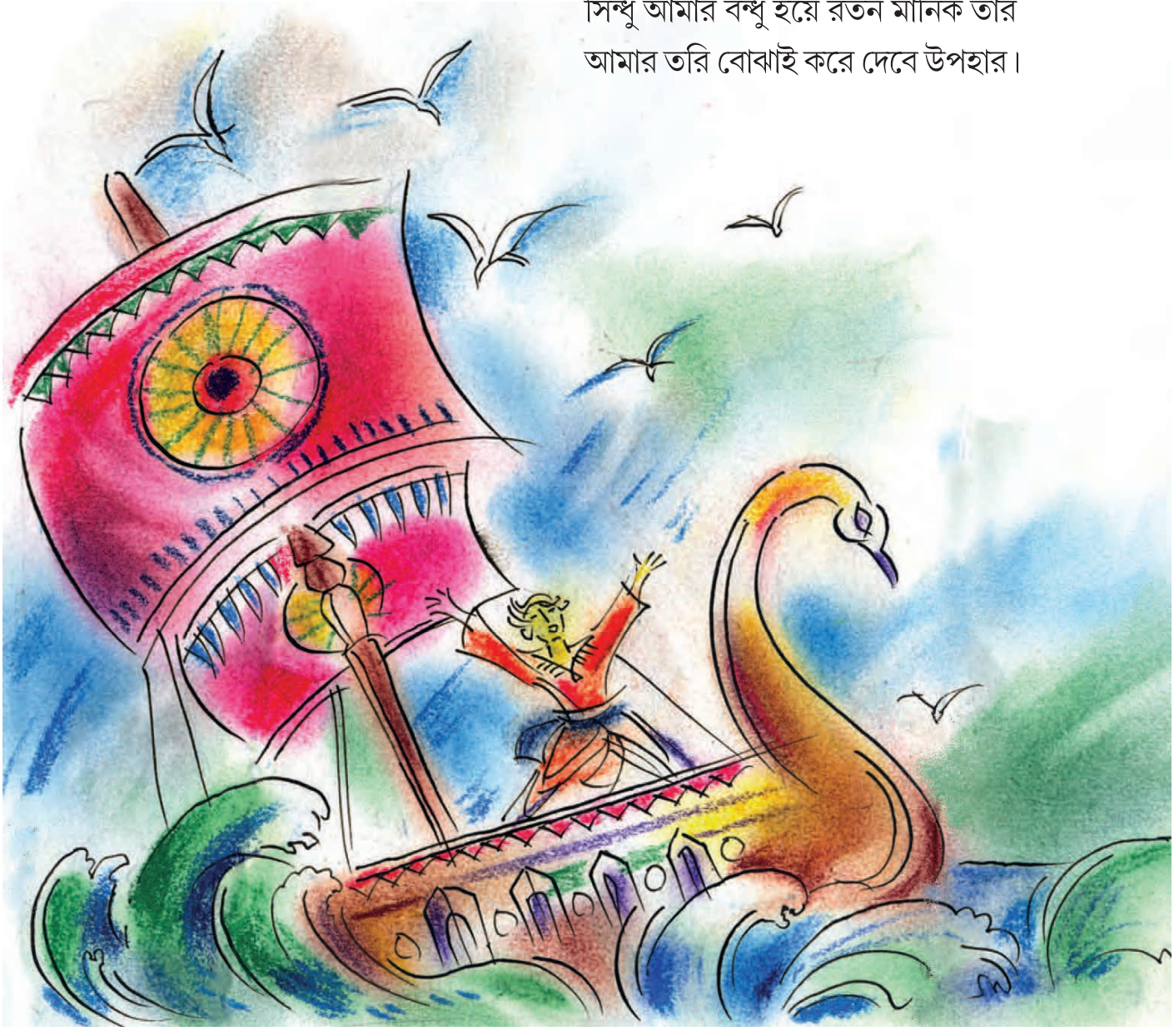

দ্বীপে দ্বীপে আমার আশায় রাখবে পেতে থানা,
শুক্তি দেবে মুক্তামালা আমারে নজরানা।
চারপাশে মোর গাঙচিলেরা করবে এসে ভিড়
হাতছানিতে ডাকবে আমায় নতুন দেশের তীর।
আসবে হাঙর কুমির তিমি — কে করে তায় ভয়;
বলব, 'ওরে, ভয় পায় যে — এ সে ছেলেই নয়।
সপ্ত সাগর রাজ্য আমার, আমি বণিক বীর,
খাজনা জোগায় রাজ্যে আমার হাজার নদীর নীর।
ভয় করি না তোদের দুটো দন্ত নখর দেখে,
জল-দস্যু, তোদের তরে পাহারা গেলাম রেখে
সিন্ধু-গাজি মোল্লামাঝি, নৌ-সেনা ওই জেলে,
বর্শা দিয়ে বিঁধবে তারা, রাজ্যে আমার এলে।'
দেশে দেশে দেয়াল গাঁথা রাখব নাকো আর,
বন্যা এনে ভাঙব বিভেদ করব একাকার।
আমার দেশে থাকলে সুধা তাদের দেশে নেব,
তাদের দেশের সুধা এনে আমার দেশে দেবো
বলব মাকে, 'ভয় কী গো মা, বাণিজ্যেতে যাই!
সেই মণি মা দেব এনে তোর ঘরে যা নাই।
দুঃখিনী তুই, তাইতো মা এ দুখ ঘুচাব আজ,
জগৎ জুড়ে সুখ কুড়াব — ঢাকব মা এ লাজ।'
লাল জহরত পান্নাচুনি মুক্তামালা আনি
আমি হব রাজার কুমার, মা হবে রাজরানি।

হাতে কলমে

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯—১৯৭৬) : কাজী নজরুল ইসলাম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কাজী ফকির আহমেদ। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য* নামক পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা *মুক্তি* প্রকাশিত হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে *বিজলী* পত্রিকায় *বিদ্রোহী* কবিতা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কবি তাঁর কবিতায় কেবল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, সমস্ত অন্যায় অবিচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর রচিত বইগুলো হলো — *অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, সাম্যবাদী, সর্বহারা, ফণীমনসা, প্রলয়শিখা*।

১. কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কাব্য জগতে কী অভিধায় অভিহিত?

২. তাঁর লেখা দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

৩. কবিতায় উল্লিখিত 'বিভেদ' শব্দটি দেখো। 'ভেদ' শব্দটির আগে 'বি' বসে তৈরি হয়েছে নতুন শব্দ 'বিভেদ'। নীচে বেশ কিছু শব্দ দেওয়া হলো। নীচের শব্দগুলির আগে 'বি' যোগ করে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করো :

ভাগ		হার	
তৃষ্ণা		জ্ঞান	
চার		ক্রয়	

শব্দার্থ : পাড়ি — রওনা, যাত্রা। সওদাগর — ব্যবসায়ী। সপ্ত মধুকর — মনসামঙ্গালে বর্ণিত বণিক চাঁদ সওদাগরের সাতটি বাণিজ্য তরির মধ্যে অন্যতম। সওদা — পণ্যদ্রব্য। ময়ূরপঙ্খি — ময়ূরাকৃতি নৌকাবিশেষ। বজরা — বড়ো এবং ধীরগামী নৌকাবিশেষ। মরাল — রাজহাঁস। সিন্ধু — সমুদ্র, সাগর। রতন — রত্ন, দামি পাথর। তরি — নৌকা। থানা — ঘাঁটি, এই কবিতায় 'পাহারা দেওয়া' অর্থে ব্যবহৃত। জহরত — বহুমূল্য পাথর। শুক্তি — ঝিনুক। নজরানা — উপঢৌকন বা ভেট। তায় — তাকে। বণিক — ব্যবসায়ী। খাজনা — কর, রাজস্ব। নীর — জল। দন্ত - নখর — দাঁত - নখ। জলদস্যু — নদী বা সমুদ্রে ডাকাতি করে যারা। তরে — জন্যে। সিন্ধুগাজি — সমুদ্রের পিরসাহেব। বর্শা — একধরনের অস্ত্র। বিভেদ — পার্থক্য, ভেদাভেদ। একাকার — মিলেমিশে যাওয়া। সুধা — অমৃত। দুঃখিনী — যে নারীর দুঃখ ঘোচে না। ঘুচাব — ঘুচিয়ে দেব, দূর করে দেব। কুড়াব — সংগ্রহ করব। লাজ — লজ্জা, শরম।

৪. **নির্দেশ অনুসারে লেখো :**

৪.১ 'তালে তালে' শব্দটিতে একই শব্দ পরপর দুবার বসেছে। তোমাদের কবিতায় দেখত এরকম একই শব্দ পাশাপাশি দুবার বসে কী কী শব্দ তৈরি হয়েছে।

৪.২ 'তালে তালে' শব্দটিতে যেমন একই বর্ণ 'ল' দু-বার বসেছে তেমনি 'ল' ধ্বনিকে দু-বার ব্যবহার করে আরও একটি শব্দ লেখো।

৪.৩ উপরের প্রশ্ন দুটিতে ব্যবহৃত শব্দটির মতো পাঁচটি শব্দ তুমি নিজে তৈরি করো।

৪.৪ 'র' ধ্বনিকে দুবার ব্যবহার করে দেখ তো কোন কোন শব্দ পাও। একটি করে দেওয়া হলো। যেমন — থরথর

৫. **কোন কোন শব্দগুলির অন্ত্যমিল আছে তাদের মেলাও :**

সওদাগর	মাল্লামাঝি
আজ	বন্ধু
বদর-গাজি	লাজ
সিন্ধু	মধুকর

৬. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

৬.১ সওদাগর কোথায় পাড়ি দিতে চায়?

৬.২ ময়ূরপঙ্খি বজরা কিসের মতো দুলে দুলে চলবে?

৬.৩ শুক্তি সওদাগরকে কী নজরানা দেবে?

৬.৪ কথক সওদাগর হয়ে কাদের ভয় পান না?

৬.৫ কথক সওদাগর কীভাবে বিভেদ ভেঙে সমস্তকে একাকার করতে চান?

৬.৬ কথক কাদের জলদস্যু বলেছেন? তাদের জন্য তিনি কাদের পাহারায় রেখে যেতে চান?

৬.৭ 'দেশে দেশে দেয়াল গাঁথা' — বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? কী ভাবে তিনি এর প্রতিকার করবেন?

৬.৮ কবিতায় কথক কোন কোন জিনিসকে 'সাত সংখ্যা' দিয়ে উল্লেখ করেছেন?

৬.৯ দুঃখিনী মায়ের দুঃখ ঘোচাতে কবি কী করতে চান?

৬.১০ কবিতায় কোন কোন রত্নের উল্লেখ আছে খুঁজে বার করো।

৬.১১ কবিতায় কোন কোন জলজ প্রাণীর উল্লেখ আছে?

৭. কবিতায় ‘বেচাকেনা’ শব্দদুটি একসঙ্গে বসলেও শব্দ দুটি বিপরীতার্থক। পাশের শব্দঝুড়ির সাহায্যে এরকম কিছু শব্দের শূন্যস্থান পূরণ করো :

	বাঁচন		পাতাল
দেনা			দুঃখ
অগ্র		ওঠা	
	আঁধার		গোড়া

শব্দঝুড়ি
আলো, আকাশ,পাওনা, আগা, সুখ, নামা, মরণ, পশ্চাৎ

৮. মনে করো , তুমি সওদাগর। বিভিন্ন দেশে জিনিসপত্র বেচাকেনা করতে যাও। জিনিসপত্র ছাড়া আর কী কী তুমি বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দেবে? তাদের দেশ থেকে কী কী তোমার সঙ্গে আনবে?

ধাঁধার ছড়া

ভাবি আর বলি

১. জল খেলে মরে যায়।

২. নেই মই নেই ডানা, দেয় তবু আকাশে হানা।

৩. কখনও ভুল করে না অথচ সব সময় মার খায়—কে সে?

৪. বসে এক কোণে উড়ে যায় বিশ্বভ্রমণে।

৫. জিনিসটা তোমারই অথচ অন্যে ব্যবহার করে তোমার চাইতে বেশি—কী সেটা?

৬. ভরা পেটে হেলে রয়, খালি পেটে সোজা হয়।

৭. তোমার ডান হাত দিয়ে কোন জিনিস তুমি কখনও ধরতে পারো না।

৮. ছোট্ট দুটি জানালা। তা দিয়ে পুরো পৃথিবী দেখা যায়।

৯. পা ছাড়া আসে যায়, জিভ ছাড়া কথা কয়।

১০. জন্মেও জন্মায়নি, না জন্মেও জন্মেছে—কী সেটা?

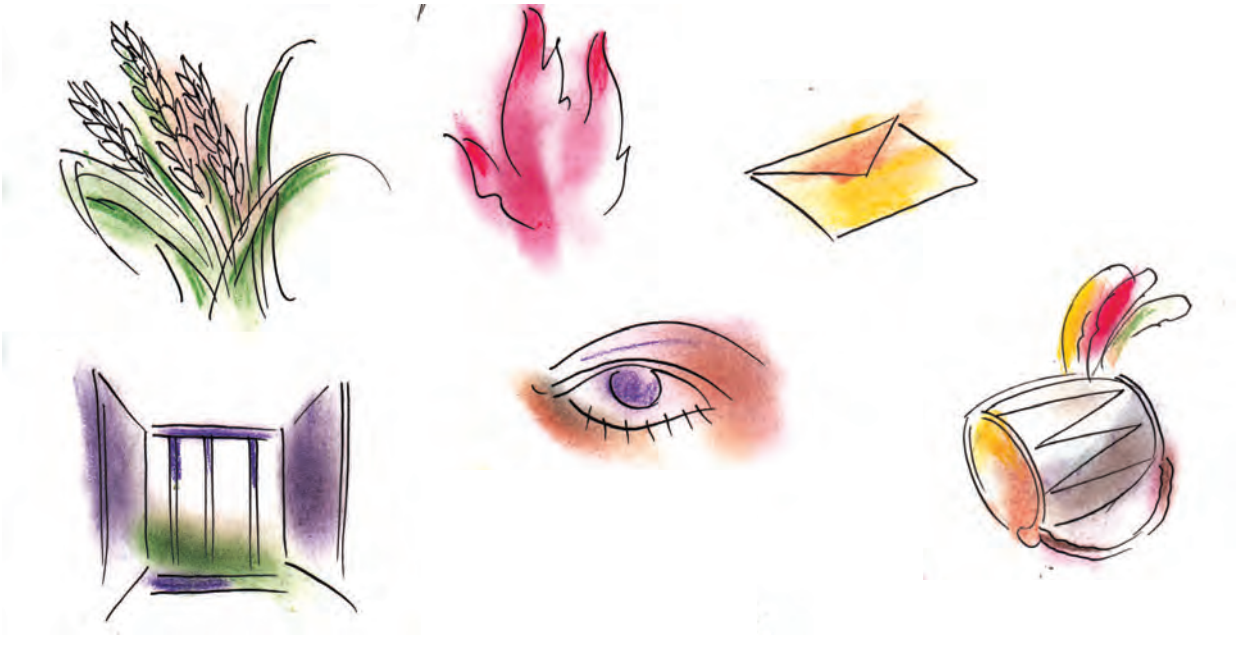

১. আগুন। ২. ধোঁয়া। ৩. ঢাক। ৪. ডাকটিকিট। ৫. তোমার নাম। ৬. ধান গাছ।
৭. তোমারই ডান হাত। ৮. দুটি চোখ। ৯. চিঠি। ১০. ডিম

দক্ষিণমেরু অভিযান

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

জ্ঞানের সীমাকে বাড়াবার জন্য, অজানাকে জানবার জন্য মানুষ যে কী অসাধ্যসাধন করছে বা করতে পারে, কাপ্টেন স্কটের আবিষ্কারের কাহিনি থেকে তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুন ইংল্যান্ডের ডিভনশায়ারের এক গ্রামে স্কট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষেরা অনেকেই সামুদ্রিক বিভাগে বড়ো বড়ো চাকরি করে গিয়েছেন। সমুদ্রের প্রতি একটা টান নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্য ছেলেবেলা থেকেই তিনি জাহাজে কাজ শিখতে থাকেন এবং কিশোরকালেই জাহাজের কাজে লেগে সমুদ্রযাত্রা করেন।

এই সময়ে জগতের নানা দেশ থেকে দক্ষিণমেরু আবিষ্কারের নানারকমের চেষ্টা চলছিল। কোন জাতির লোক আগে গিয়ে সেখানে পৌঁছোতে পারে সেই নিয়ে একটা গোপন আকাঙ্ক্ষা সব জাতিরই অন্তরে জমা ছিল।

স্কট যখন কমাণ্ডার হন, সেই সময়ে ইংল্যাণ্ডে দক্ষিণমেরু অভিযানের জন্য একটা দল গড়া হচ্ছিল। ‘রয়েল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটি’ এই অভিযানটির আয়োজন করেছিলেন। একদিন স্কট লণ্ডনের পথে বেড়াচ্ছেন এমন সময় উক্ত সোসাইটির প্রেসিডেন্ট স্যার ক্লেমেন্টস মার্কহামের সঙ্গে তাঁর দেখা। স্যার মার্কহামের সঙ্গে পরামর্শ করে স্কট এই অভিযানের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করলেন।

১৯০১ সালের আগস্ট মাসে ‘ডিসকভারি’ নামক জাহাজে স্কট তাঁর দলবল নিয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে দক্ষিণমেরুর দিকে যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গে আর একজন খুব বড়ো নাবিক ছিলেন, তাঁর নাম স্যার আর্নস্ট স্যাকলটন।

দক্ষিণমেরুকে জগতের সকলের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবার জন্যে বিধাতাপুরুষ তার চারিদিকে দুর্লঙ্ঘ্য বরফের প্রাচীর গড়ে রেখেছেন এবং তার ওপারে জাহাজ নিয়ে আর মানুষ যেতে পারে না। মাঝে মাঝে এই বরফের প্রাচীরে ফাঁক দেখা যায়, বরফ যখন গলতে থাকে।

ক্যাপ্টেন স্কট তাঁর দলসুদ্ধ সেই বরফের প্রাচীরের মাঝে এসে উপস্থিত হলেন, কিন্তু বরফের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার কোনো পথ না দেখে তিনি ফিরে আসতে বাধ্য হলেন এবং ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কিং এডওয়ার্ড দ্বীপে নোঙর ফেলে রইলেন। তখন দুরন্ত শীত, সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়ে গেছে। তাঁরা ঠিক করলেন যে আর কিছু দিন পরে শ্লেজে করে যাত্রা করা যাবে।

মাসকয়েক কাটিয়ে ১৯০২ সালের নভেম্বর মাসে শ্লেজযাত্রার সমস্ত আয়োজন হয়ে গেল। ঠিক হলো যে, স্কট, স্যাকলটন ও উইলসন মাত্র এই তিনজনে যাত্রা করবেন এবং সঙ্গে উনিশটা কুকুর নেওয়া হবে।

যাত্রা শুরু হলো সেই নির্দিষ্ট দেশের দিকে। কিছু দূরে যেতে না যেতে নানা প্রকারের বাধা আসতে লাগল। ক্রমশ তাঁরা এগোতে লাগলেন। যেখান দিয়ে যান সেখানে এক এক জায়গায় তাঁবু ফেলে খাবার রেখে যান এবং প্রত্যেক তাঁবুর উপর একটা করে পতাকা গুঁজে রাখেন, কারণ ফেরবার সময় যখন খাবার দরকার হবে তখন এই সমস্ত তাঁবু থেকেই তা পাওয়া যাবে এবং ফেরবার পথেরও নিশানা হবে।

সমস্ত নভেম্বর আর ডিসেম্বর মাস তাঁরা সেই বরফের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন। যতই এগোতে লাগলেন ততই বরফের ঝড় তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগল। কুকুরগুলো ক্রমশ অবশ হয়ে আসতে লাগল। এই রকম অবস্থায় আর বেশি দূর এগোনো যায় না দেখে স্কট ফিরলেন। ফিরবার পথে বিপদ আরও ঘনিয়ে এল। স্যাকলটনের হলো অসুখ; খাবারের ডিপোগুলো এত দূরে দূরে পোঁতা হয়েছিল যে এক ডিপো থেকে আর এক ডিপোতে পৌঁছোতে সবাই ক্ষুধায় অবসন্ন ও অজ্ঞান হয়ে পড়তে লাগল। বিশেষ করে কুকুরগুলো, তারাই শ্লেজ টেনে নিয়ে চলেছে। সেই জন্য কুকুরের খাবার জোগাবার জন্যে নিরুপায় হয়ে তাঁরা এক একটা কুকুর মেরে তারই মাংস অপর কুকুরগলোকে খাওয়াতে লাগলেন। এইরকম করে তাঁরা কোনোরকমে জীবন নিয়ে সে যাত্রায় আবার কিং এডওয়ার্ড দ্বীপে ফিরে এলেন।

কয়েক মাস সেই দ্বীপে কাটিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলেন। এবার সঙ্গে মাত্র দুজন সঙ্গী ইভানস আর লাসলি। এবার তাঁরা চাকাওয়ালা শ্লেজে যাত্রা করলেন, সঙ্গে কুকুর নিলেন না। কিন্তু অনেক দূরে যাওয়ার পর খাদ্যের সংস্থান ফুরিয়ে আসতে লাগল; এবারেও তাঁরা ফিরতে বাধ্য হলেন।

১৯০৩ সালের শেষাশেষি আবার তাঁরা তাঁদের জাহাজে ফিরে এলেন এবং ঠিক করলেন এবারকার মতো ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু নতুন বিপদ ঘটল। সামনের সমস্ত পথ বরফে বন্ধ হয়ে গেছে। বারো মাইল পর্যন্ত ঘন বরফ পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল। তাঁরা নানারকমের যন্ত্র দিয়ে সেই বরফ কেটে পথ তৈরি করতে লাগলেন, কিন্তু কিছু দিন চেষ্টা করে বুঝলেন, এ অসাধ্যসাধন। বরাতক্রমে সেবার খুব শীগগির বরফ গলতে আরম্ভ করল এবং কিছু দিন যেতে না যেতেই স্কট দেখলেন বরফ গলে তাঁদের যাওয়ার পথ তৈরি হয়ে গেছে। তাঁরা এ যাত্রায় যতদূর গিয়েছিলেন তার থেকে আরও ৪৬৩ মাইল দূরে ছিল দক্ষিণমেরু। কিন্তু এর আগে কেউই আর দক্ষিণমেরুর এত কাছে আসতে পারেননি।

স্যার আর্নেস্ট স্যাকলটন ১৯০৮ সালে নিজের দল নিয়ে আবার দক্ষিণমেরুর দিকে রওনা হলেন, কিন্তু তাঁকে ফিরে আসতে হলো। তবে এবার আরও ৯৭ মাইল যেতে পারলেই স্যাকলটনের ভাগ্যেই দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের প্রথম গৌরব লেখা থাকত।

ক্যাপ্টেন স্কট যখন শুনলেন যে স্যার স্যাকল্টন ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছেন তখন তিনি আর ঘরে শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারলেন না। ঠিক করলেন যে, এবার তিনি যে যাত্রা করবেন, তাতে হয় দক্ষিণমেরুতে পৌঁছোবেন, নয় ইংল্যাণ্ডে আর ফিরবেন না। এবার স্কট দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছোলেন বটে, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে আর তাঁর ফেরা হলো না।

১৯১০ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে দলবল নিয়ে স্কট 'টেরানোভা' জাহাজে দক্ষিণমেরুর পথে আবার যাত্রা করলেন। ১৯১১ সালের প্রথম দিকে তিনি আবার সেই দুর্লঙ্ঘ্য বরফের প্রাচীরের কাছে উপস্থিত হলেন।

এখান থেকে দক্ষিণমেরু ৩৫০ মাইল দূরে। এই সাড়ে তিনশো মাইল যাওয়া এবং ফিরে আসার আয়োজন করতেই সেপ্টেম্বর মাস এসে গেল। ১৯১২ সালের নববর্ষের প্রথম দিনে আটজন সঙ্গী নিয়ে তিনি দক্ষিণমেরুর ১৭০ মাইলের মধ্যে এসে পড়লেন। সেখানে কয়েকদিন বিশ্রাম করে যাত্রার পথে মাত্র চারজন সঙ্গীকে নিয়ে রওয়ানা হলেন। সঙ্গে যে যে রসদ নেওয়া হলো তা ডিপোতে ডিপোতে জমা রেখে তাঁরা ক্রমশ দক্ষিণমেরুর দিকে এগিয়ে চলতে লাগলেন; এবং পথে কোনো

বিশেষ বিপদের মধ্যে না পড়ে তাঁরা ১৮ জানুয়ারি ১৯১২ সাল, তাঁদের জীবনের ঈপ্সিত দেশ দক্ষিণমেরুতে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ক্যাপ্টেন স্কট সেখানে উপস্থিত হয়েই দেখেন যে, যেখানে তাঁরা তাঁদের দেশের পতাকা প্রথমে পুঁতবেন বলে ভেবেছিলেন সেখানে নরওয়ে দেশের পতাকা উড়ছে, তাঁদের কয়েক সপ্তাহ আগে নরওয়ের বিখ্যাত আবিষ্কারক আমুন্ডসেন দক্ষিণমেরুর প্রথম আবিষ্কর্তার গৌরব অর্জন করে চলে গেছেন। সেই জনমানবহীন অনন্ত তুষারের দেশে নরওয়ের পতাকা, আর কাষ্ঠফলকে আমুন্ডসেনের নাম তাঁর বিজয়বার্তা ঘোষণা করছে।

এবার ফেরবার পালা। যাওয়ার সময় তখন কোনো বিপদ হয়নি, কিন্তু ফেরবার মুখে পথে পথে ভয়াবহ বিপদ এসে বাধা দিতে লাগল। হাওয়া আর বয় না, তার জায়গায় বয় জমাট বরফের কণা। দিনের পর দিন আকাশ পৃথিবী কিছুই দেখা যায় না, শুধু বরফের বৃষ্টি। সেই ভয়াবহ অবস্থার মধ্য দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় পাঁচজন লোক চলেছে। পথের দিশা অনন্ত তুষারপাতের মধ্যে হারিয়ে গেছে; অনাহারে সর্বশরীর অবসন্ন। একদিন সেই অবস্থায় ইভানস পড়ে গেলেন, আর উঠলেন না। শুভ্র তুষার এসে তাঁর মৃতদেহের উপর কবর রচনা করল। তুষারপাত প্রতিদিন বেড়ে চলতে লাগল। অবশেষে তাঁরা একটি ডিপোতে এসে উপস্থিত হলেন। এরপর ক্যাপ্টেন ওটস এক রাত্রে বাইরে গেলেন, কিন্তু আর ফিরলেন না।

সেই ভয়াবহ অবস্থার মধ্য দিয়ে অবশিষ্ট দুজন সঙ্গীকে নিয়ে স্কট অগ্রসর হতে লাগলেন। অবশেষে অবসন্ন দেহে নিরুপায় হয়ে তাঁদের সঙ্গে যে তাঁবু ছিল, তাই খাটিয়ে তার ভিতরে ঢুকলেন তাঁরা। তাঁরা তখন ভালোরকমই জানতেন যে, এই তাঁবুই তাঁদের কবর। পাশের সঙ্গীর তখন মৃত্যুশ্বাস উপস্থিত, মৃত্যুর হিমস্পর্শে তখন ক্যাপ্টেন স্কটেরও সর্ব অঙ্গ শিথিল হয়ে আসছে। সেই মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বক্ষণে তিনি তাঁর ডায়ারির শেষ পাতা লেখেন— 'গত এক মাস আমরা যে কষ্ট পেয়েছি, আমি ভাবতে পারি না, কোনো মানুষ কোনো দিন সেরকম কষ্ট সহ্য করেছে কিনা। তবুও আজ ভাগ্যের বিরুদ্ধে আমার কোনো নালিশ নেই, যা পেয়েছি তা মাথা পেতে গ্রহণ করেছি। যদি আমরা বেঁচে থাকতে পারতাম, তাহলে সমস্ত ইংল্যান্ড শুনতে পেত যে, ইংল্যান্ডের গৌরবের জন্য তাঁর কয়েকজন সন্তান কী কষ্টই না সহ্য করেছে— আমাদের এই মৃতদেহ আর আমার এই লেখা হয়তো জগতে একদিন সে কাহিনির সাক্ষ্য দেবে—।' ক্যাপ্টেন স্কটকে যারা খুঁজতে গিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁর মৃতদেহের সঙ্গে তাঁর ডায়ারিও পান।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (১৯০৫—১৯৬৩) : কল্লোল যুগের একজন জনপ্রিয় লেখক। অনুবাদ ও শিশুসাহিত্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। গল্প, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও ধর্ম প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় নিয়ে তিনি লিখেছেন। তিনি একাধারে গীতিকার, অভিনেতা, কাহিনিকার, চিত্রনাট্যকার ও চিত্র পরিচালক। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই হলো *দুর্গম পথে*, *দুঃখজয়ীর দল*, *বন্ধুর চিঠি*, *না জানলে চলে না* ইত্যাদি। তাঁর অনূদিত কয়েকটি বিখ্যাত বই হলো *মা*, *কুলি* প্রভৃতি। বর্তমান রচনাটি তাঁর *নতুন যুগের মানুষ* বই থেকে নেওয়া।

১. *দক্ষিণমেরু অভিযান* রচনাংশটি লেখকের কোন বই থেকে নেওয়া?

২. তাঁর লেখা আরো দুটি বইয়ের নাম লেখো।

৩. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

৩.১ স্কট____ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

৩.২ ছেলেবেলা থেকে স্কট ____কাজ শিখতে থাকেন।

৩.৩ প্রত্যেক তাঁবুর উপর একটা করে ____ গুঁজে রাখা হলো।

৩.৪ ১৯১০ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে দলবল নিয়ে স্কট ____ জাহাজে করে দক্ষিণমেরুর পথে আবার যাত্রা করলেন।

৩.৫ ক্যাপ্টেন স্কট এর মৃতদেহের সঙ্গে তার ____ পাওয়া যায়।

৪. গল্পটিতে যে ইংরাজি মাসের নামগুলি পেয়েছ সেগুলি সাজিয়ে লেখো। সেই সেই মাসের ঘটনাগুলি পাশাপাশি উল্লেখ করো।

৫. দক্ষিণমেরু অভিযানে ক্যাপ্টেন স্কটের সাহায্যকারী কোন কোন ব্যক্তির নাম পেয়েছ তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

৬. **বাক্যরচনা করো :** শ্লেজ, আবিষ্কার, গৌরব, ব্যর্থ, সমুদ্রযাত্রা।

৭. **দক্ষিণমেরু অভিযানে স্কট যে যে বিপদের মুখে পড়েছিলেন তার তালিকা তৈরি করো :**

(একটি উদাহরণ দেওয়া হলো।)

অভিযান	বিপদ
স্কটের দক্ষিণমেরু অভিযান	বরফের ঝড়

শব্দার্থ : আকাঙ্ক্ষা — ইচ্ছা, বাসনা। অন্তর — ভিতর। দুর্লঙ্ঘ্য — যাকে সহজে লঙ্ঘন অর্থাৎ পার করা যায় না। প্রাচীর — পাঁচিল। শ্লেজ — বরফের ওপর কুকুরে টানা গাড়ি। নির্দেশ্য — নির্ধারিত। নিশানা — নির্দশন। বরাতক্রমে — ভাগ্যের জোরে। রসদ — মজুত খাদ্যদ্রব্য। কাষ্ঠফলক — কাঠের ফলক। শ্বাসরুদ্ধ — দমবন্ধ। তুষারপাত — বরফ পড়া। ডিপো — আশ্রয়স্থান। হিমস্পর্শ — বরফের মতো ঠাণ্ডা স্পর্শ। শিথিল — আলগা।

৮. নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :

৮.১ স্কটের পূর্ব পুরুষেরা কোথায় চাকরি করতেন?

৮.২ ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণমেরু অভিযানের আয়োজক সংস্থার নাম লেখো।

৮.৩ প্রথম দক্ষিণমেরু অভিযান কত সালের কোন মাসে শুরু হয়েছিল?

৮.৪ দক্ষিণমেরু যাত্রায় স্কটের সঙ্গী কারা ছিলেন? মোট কয়টি কুকুর নেওয়া হয়েছিল?

৮.৬ এডওয়ার্ড দ্বীপ থেকে দ্বিতীয়বার যাত্রাকালে কারা স্কটের সঙ্গী হয়েছিলেন?

৮.৭ স্কট আর কত মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে পারলেই দক্ষিণমেরুতে প্রথম পৌঁছাতে পারতেন?

৮.৮ ১৯০৮ সালে কে দক্ষিণমেরুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন?

৮.৯ স্যাকলটন আর কত দূর যেতে পারলেই দক্ষিণমেরু পৌঁছোতে পারতেন?

৮.১০ স্কট তৃতীয় অভিযান কত সালে শুরু করেন?

৯. নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :

৯.১ ছেলেবেলা থেকেই সামুদ্রিক অভিযানে স্কটের আগ্রহ ছিল কেন?

৯.২ স্কট ছাড়া অন্যান্যদের দক্ষিণমেরু আবিষ্কারের অভিযান প্রচেষ্টার কথা লেখো।

৯.৩ অভিযান-আবিষ্কারের কাহিনি আমাদের ভালো লাগে কেন?

৯.৪ দক্ষিণমেরু পৌঁছোনোর পরও ক্যাপ্টেন স্কট কেন খুশি হতে পারেননি? ফেরার পথে তিনি যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন তা নিজের ভাষায় লেখো।

১০. টীকা লেখো :

স্লেজ গাড়ি :

কিং এডওয়ার্ড দ্বীপ :

ডিসকভারি :

রয়েল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটি :

টেরানোভা :

স্কট :

মিলিয়ে পড়ো	দূরকে জানা যেমন আনন্দদায়ক। ঠিক তেমনই নিজের নিকট চারপাশকেও ভালো করে জানা ও চেনা অত্যন্ত জরুরি। কবিতায় যেন সেই সত্যই ফুটে উঠেছে।

বহু দিন ধরে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু॥

পঞ্চম পাঠ

আলো

লীলা মজুমদার

পাত্র-পাত্রী

১. পিসি ২. শম্ভু ৩. নিতাই ৪. গুরুমশাই

এছাড়া বেড়াল, গায়কগণ ইত্যাদি